গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ৪ সংখ্যা ২২ - ২৮ আগস্ট, ২০০৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

নির্বাচনী স্বার্থেই জম্মু-কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে

— নীহার মুখার্জী

বিগত কয়েকদিন জম্মু ও কাশ্মীরে ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডে, বিশেষত পুলিশের গুলিতে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ১৫ আগস্ট এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এক বিবৃতিতে দৃঢ়ভাবে বলেন, এই বেপরোয়া গুলিচালনা ও হত্যাকাণ্ডের জন্য পুরোপুরি দায়ী কেন্দ্র ও জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য সরকার। সাথে সাথে বিজেপি ও কংগ্রেস সহ অন্যান্য বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলি জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা ও লোকসভার আগামী নির্বাচনে ফয়দা তোলার উদ্দেশ্যে নিকৃষ্টতম সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে তুলছে এবং তার দ্বারা রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হত্যালীলাকে প্রত্যক্ষ মদত দিচ্ছে।

সরকার কর্তৃক বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ করা এবং কট্টর সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে কমরেড মুখার্জী বলেন, চল্লিশ হেক্টর বনভূমি অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে দেওয়ার যে ইস্যুকে কেন্দ্র করে বর্তমান হিংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা সমাধানের জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল, বিবদমান সমস্ত শক্তিকে নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার মীমাংসা করতে হবে এবং এই কাজে সরকারকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

অমীমাংসিত কাশ্মীর সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে জম্মু-কাশ্মীরের বর্তমান অগ্নিগর্ভ অবস্থাকে সঠিকভাবে যে বোঝা সম্ভব নয়, এ'কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে কমরেড নীহার মুখার্জী বলেন, কাশ্মীরের জনগণের স্বাধিকার ও নিজস্ব স্বীকৃতি হারাবার আতঙ্ক, নিজস্ব সম্পদ হারাবার ভয় যতদিন না পুরোপুরি দূর হবে ততদিন এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়কে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে তোলার সম্ভাবনা সর্বদা থেকে যাবে। কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে দলের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে কমরেড নীহার মুখার্জী, জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সনদে স্বীকৃত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭০ ধারায় স্বীকৃত, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি করেন এবং বলেন, একমাত্র এর ভিত্তিতেই কাশ্মীর সমস্যার চূড়ান্ত ও স্থায়ী সমাধান হতে পারে। তিনি আরও বলেন, মিলিটারি দিয়ে ও রাজনৈতিকভাবে কাশ্মীরের জনগণকে দমন করার পথ ভারত সরকারকে পুরোপুরি ছাড়তে হবে। বর্তমান ইস্যুটির রাজনৈতিক সমাধানে সকল শক্তি নিয়োজিত করে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণই এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে প্রশমিত করার একমাত্র পথ।

রিজওয়ানের খুনিদের শাস্তি দিতে হবে

রিজওয়ান হত্যা মামলায় ১৪ আগস্টের হাইকোর্টের রায় আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল রাজ্যের শাসকদলের উচ্চমহলের প্রত্যক্ষ মদতে রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন কী বেপরোয়াভাবে বিত্তশালী অশোক টোডিদের স্বার্থে একের পর এক বেআইনি কাজ ও অপরাধ করে গিয়েছে। এই দিন এক বিবৃতিতে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এ রাজ্যে পুলিশ-প্রশাসন যে এভাবেই সিপিএমের স্বার্থে কাজ করে, এ ঘটনায় তা আবারও প্রমাণিত হল।

গত বছর অশোক টোডির কন্যা প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে রিজওয়ানের আইনসম্মতভাবে বিয়ে হয়। এই বিয়ে ভাঙতে টোডিরা পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর পরই রিজওয়ান খুন হন। ২১ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে দশটায় পাতিপুকুর রেললাইনের ধারে রিজওয়ানের মৃতদেহ পাওয়া যায়। এলাকার মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ও সম্মানীয় যুবকের মৃত্যুতে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রিয়ঙ্কার পিতা বিত্তবান, ক্রিকেট জুয়া সহ নানা অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত অশোক টোডির স্বার্থে পুলিশ বেআইনিভাবে রিজওয়ানকে ভয় দেখিয়েছে, ভাড়াটে খুনিদের লাগানো হয়েছে তাঁর পিছনে— এ সব খবর জানাজানি হতেই এলাকার জনগণ অপরাধী পুলিশ ও খুনিদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়। গোটা রাজ্যের মানুষ এই মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রতিবাদে গর্জে উঠে অপরাধীদের শাস্তির দাবি তোলে। কোনও রকম তদন্ত না করেই অতিতৎপরতার সাথে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলে দেন, রিজওয়ান আত্মহত্যা করেছেন। অথচ বিবাহের পর পরই রিজওয়ান ও প্রিয়াঙ্কা বার বার পুলিশকে জানিয়েছিলেন, তাঁরা বিপন্ন। কিন্তু তাঁদের রক্ষায় পুলিশ কোনও তৎপরতা দেখায়নি। ২৩ সেপ্টেম্বর সি পি এম রাজ্য সম্পাদক পর্যন্ত বলেন, পুলিশ ঠিক কাজই করেছে। পরে জনমনে তার প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখে 'ওদের বিয়ের খবর পুলিশ জানত না' বলে মিথ্যা বিবৃতি দেন। মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাটিকে

১০ অক্টোবর, ২০০৭। রিজওয়ানের খুনিদের শাস্তির দাবিতে তাঁর বাড়ির সামনে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ, পাশে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

দুঃখজনক বলেই দায়িত্ব শেষ করেন। এইভাবে সি পি এম সরকার ও পুলিশ প্রশাসন অশোক টোডিকে বাঁচাতে নেমে পড়ে।

হাইকোর্ট তার রায়ে পরিষ্কার বলেছে — লালবাজার থানা বিত্তশালীদের পক্ষে কাজ করেছে। পুলিশ বেআইনি ও সংবিধানবিরোধী কাজ করেছে। হাইকোর্ট বলেছে, সি বি আই চাইলে অশোক টোডি সহ সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারে।

হাইকোর্টের রায় অপরাধী রাজ্য সরকার ও পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে যাওয়ায় জনসাধারণ অনেকটা খুশি। রিজওয়ানের মা ন্যায়বিচার পাওয়ার ব্যাপারে আশাও প্রকাশ করেছেন। নিঃসন্দেহে এই রায় জনগণের সুবিচার পাওয়ার পথে একধাপ অগ্রগতি। কিন্তু এটাই সব নয়। আদালত করে

ছয়ের পাতায় দেখুন

কৃষিজমি ধ্বংস করে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রসঙ্গে

কাটোয়া

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে ২০০৫ সালের ৫ আগস্ট সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে কাটোয়া, কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট থানার মোট ২৯টি মৌজার ৩৩টি গ্রামকে নিয়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৬৫০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। ২০০৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় পিডিসিএল ৯.৯১ একর জমি জোর করে দখল করে ও সেখানে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিলান্যাস করেন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন।

বর্ধমানের সবচেয়ে উর্বর কৃষিজমি ধ্বংস হবে

বর্ধমান জেলার সর্বাপেক্ষা উর্বর উক্ত মৌজাগুলির প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে ৬০-৬৫ শতাংশ প্রান্তিক, ৩০ শতাংশ ক্ষুদ্র, ৬-৭ শতাংশ মাঝারি চাষি, বৃহৎ জমির মালিক হাতে গোনা। এছাড়া আছে বেশ কয়েক হাজার ভূমিহীন খেতমজুর। এখানকার সমস্ত জমিই ৩ থেকে ৪ ফসলি। বছরে দু'বার ধান ছাড়াও আলু, গম, সরিষা, আখ, তিল, ডাল প্রভৃতি চাষ হয়। গ্রীষ্মে ধান হয় একর প্রতি ৬০/৬৫ মণ, বর্ষায় একর প্রতি ৪৫-৫০ মণ। ডিপ-টিউবওয়েল ৭টি, সাবমার্সিবল পাম্প শতাধিক, অসংখ্য সেচসেবিত পুকুর ও ক্যানেল রয়েছে। আছে ৬টি কোল্ড স্টোরেজও ৬টি রাইসমিল। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ২৫ হাজার কৃষক ও খেতমজুর পরিবারের স্থায়ী জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ হবে ও বেকারি বাড়বে। কৃষিপণ্যকে ঘিরে এলাকার কৃষক, প্রান্তিক চাষি, খেতমজুর, ক্ষুদ্র-মাঝারি-বড় ব্যবসাদার ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের এক বিরাট অংশের মানুষ বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসাবে কাটোয়া

সাতের পাতায় দেখুন

জোর করে কেড়ে নেওয়া জমি চাষিদের ফেরত দেওয়ার দাবিতে

২৪ আগস্ট

সিঙ্গুর চলো

আলুচাষিদের ভরতুকি দেওয়া ও সারের কালোবাজারি বন্ধ করে সুলভ মূল্যে সরবরাহের দাবিতে

সারা বাংলা আলুচাষি সংগ্রাম কমিটির ডাকে

গণআইন অমান্য

২৫ আগস্ট ● জমায়েত ঃ কলেজ স্কোয়ার ● বেলা ১টা

● যুদ্ধকালীন তৎপরতায় লোডশেডিং বন্ধ ● বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব বাতিল ● বিদ্যুৎমাশুলে এক হাজার কোটি টাকা সরকারি ভরতুকি প্রভৃতি দাবিতে

অ্যাবেকার আহ্বানে

বৈদ্যুতিক আলো বর্জন করুন

২৭ আগস্ট ● বুধবার ● সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০ মি পর্যন্ত

২৭ আগস্ট আধ ঘন্টা বৈদ্যুতিক আলো বর্জন করুন

সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশনের ডাক

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগস্ট মাসের মধ্যে লোডশেডিং বন্ধ করতে হবে এবং তিন বছরের জন্য একসাথে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব বিদ্যুৎ আইনের ১০৮ ধারা প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করতে হবে। এই দাবিতে আগামী ২৭ আগস্ট রাজ্যের সর্বত্র সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আলো বর্জন আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে ১৪ আগস্ট ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন থেকে।

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুজয় বসু, ওড়িশা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশান্ত চ্যাটার্জী, বিশিষ্ট লেখক কবি তরুণ সান্যাল, অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক অনুকূল ভদ্র এবং এফ টি ও, এফ টি এ এবং ফসমি প্রভৃতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বক্তারা সকলেই বৈদ্যুতিক আলো বর্জন আন্দোলনকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মাশুলও বাড়বে, আবার সাথে সাথে লোডশেডিং চলবে — এই পরিস্থিতি কোনওমতেই মেনে নেওয়া হবে না। এর ফলে ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং কৃষি গভীর সঙ্কটে পড়ে যাচ্ছে। কনভেনশনের সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, খোলাবাজার অর্থনীতির পরিপূরক বিদ্যুতের বাজার তৈরি করা হয়েছে। সেই বাজারে বেশি দামে অন্য রাজ্যের কাছে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। সরকারের জ্ঞাতসারে পশ্চিমবঙ্গকে অন্ধকারে রেখে অতি মুনাফার লোভে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো এ'কাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গে সব কয়টি বিদ্যুৎ কোম্পানি লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও ১০ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশ মাশুলবৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারকে হয় মাশুল কমাতে হবে, না হলে অন্যান্য রাজ্যের মতো ভর্তুকি ঘোষণা করতে হবে।

বাঁদিক থেকে সুশান্ত চ্যাটার্জী, তরুণ সান্যাল, সঞ্জিত বিশ্বাস, সুজয় বসু, অনুকূল ভদ্র ও অমল মাইতি

তমলুকে বাহারি পাতা চাষিদের বিক্ষোভ

৪ আগস্ট তমলুক ব্লকের ফুল ও পাতাচাষি সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে দুই শতাধিক বাহারি পাতা চাষি বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে তাঁদের জীবন-জীবিকার দাবি নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁদের দাবি — ব্লকের রাধামণিতে প্রস্তাবিত পানবাজারে সন্ধ্যায় বাহারি পাতার বাজার করার অনুমতি দিতে হবে। বিগত বছরের ফুলচাষিদের ক্ষতিপূরণ সহ এ বছরের ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত বাহারি পাতা চাষিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এলাকার গঙ্গাখালি-শংকরআড়া-পায়রাটুঙ্গি খালগুলির পূর্ণ সংস্কার করতে হবে।

বিক্ষোভ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমিটির সভাপতি তারাশঙ্কর মুখার্জী, যুগ্মসম্পাদক পরিমল মাইতি, সৌমিত্র পট্টনায়ক ও সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক।

তমলুক ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩০-৩৫টি গ্রামের প্রায় দু-আড়াই হাজার চাষি অ্যাসপ্যারাস, এরিকা, ঘোড়াপাম, বটলব্রাশ, মানিপ্ল্যান্ট প্রভৃতি বাহারি পাতার চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। স্থানীয় কোনও বাজার না থাকায় প্রত্যহ ভোররাতে ঐ চাষিদের দেউলিয়া, কোলাঘাট ও কলকাতার মল্লিকঘাট ফুলবাজারে বাহারি পাতা বিক্রি করতে আসতে হয়। খাল সংস্কারের অভাবে প্রায় প্রতিবছর এলাকা জলমগ্ন হয়ে ঐ চাষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কালনা ব্লকের সমস্যা নিয়ে আধিকারিকদের সাথে বৈঠক

কালনা ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে রাস্তাঘাটের দুরবস্থা, পানীয় জলের প্রবল সঙ্কট, প্রকৃত গরিব মানুষদের বিপিএল কার্ড না পাওয়া ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১ আগস্ট কালনার বিডিও-কে এস ইউ সি আই ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কমরেডস্ নির্মল মাঝি ও সমীর ধাড়ার নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিরা বিডিও-র সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি পানীয় জলের সঙ্কট মোচনে টিউবওয়েল বসাবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং বাকি সমস্যাগুলি নিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের আশ্বাস দেন।

শ্রমিকদের এম ডি অফিস অবরোধ

বার্নপুরের রিলাইনিং ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে শ্রমিক-কর্মচারীরা সমস্ত রিলাইনিং শ্রমিকের স্থায়ী চাকরির দাবিতে ১৭ জুলাই এম ডি অফিস অবরোধ করে। প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ চললেও প্রায় দু'শ ছাঁটাই শ্রমিক সহ তাদের পরিবারের সদস্যরা শান্তিপূর্ণভাবে এই ঘেরাওয়ে অংশগ্রহণ করেন। বিকালের দিকে হঠাৎ পুলিশ এসে জবরদস্তি করে এই অবরোধ তুলে দেয় এবং রিলাইনিং ওয়ার্কার্সদের সহযোগী সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ইসকো এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সম্পাদক সঞ্জয় চ্যাটার্জীকে গ্রেপ্তার করে হিরাপুর থানায় নিয়ে যায়। রাত্রে রিলাইনিং ওয়ার্কাররা মিছিল করে গিয়ে থানা ঘেরাও করে সঞ্জয় চ্যাটার্জীর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করে। অধিক রাত্রে এস পি-র নির্দেশে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। অবরোধে এ আই সি সি ও, শ্রমিক-কর্মচারী সমন্বয় কমিটি, ইসকো মজদুর ইউনিয়ন, আই এন টি ইউ সি এবং টি এম সি-র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফাজিলনগর হাইস্কুলে ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের জয়

বিগত শিক্ষাবর্ষ থেকে ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নদিয়ার ফাজিলনগর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাঁচাও কমিটি গঠিত হয়। ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কমিটির উদ্যোগে টিচার ইনচার্জকে একাধিকবার ডেপুটেশন দেওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনও কার্যকরী ভূমিকা পালন করেননি। এ বছর শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই কমিটির উদ্যোগে ঘেরাও, বিক্ষোভ সংগঠিত হয় এবং ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এসডিও, বিডিও, এসআই এবং লোকাল থানাকে জানানো হয়। শেষ পর্যন্ত স্কুল টিচার ইনচার্জ পর্ষদ নির্ধারিত ৬৩ টাকা ফি নিয়ে ভর্তি করতে বাধ্য হন। ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের এই জয় সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। স্কুলে লাইব্রেরি গড়ে তোলার দাবিতে এবং পঠন-পাঠনের চূড়ান্ত অব্যবস্থা, প্রতি বছর বই পাল্টানো, মিড ডে মিলের প্রচুর অর্থ নয়ছয়, টিচার ইনচার্জের আপত্তিজনক আচরণ সহ দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষার সর্বস্তরে ফি-বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে এ আই ডি এস ও নদিয়া জেলা সম্পাদক কমরেড কামালউদ্দিন বলেন, যাঁরা বলেন আন্দোলন করে কিছু হয় না, এ আন্দোলন প্রমাণ করল, তাঁদের ধারণা ভুল। বাস্তবে আন্দোলনের চাপ না থাকলে ছাত্রছাত্রীদের উপর ফি-র বোঝা আরও বাড়বে।

বর্ধমানে এস ডি ও দপ্তরে ছাত্র বিক্ষোভ

শিক্ষায় সরকার নির্ধারিত ফি দ্বিগুণ করা, গ্যাটস্-এর মাধ্যমে শিক্ষায় বেসরকারীকরণ, স্কুলস্তরে জীবনশৈলী শিক্ষার নামে যৌনশিক্ষা প্রচলনের প্রতিবাদে এবং গ্রেডেশন প্রথা বাতিলের দাবিতে এ আই ডি এস ও কাটোয়া লোকাল কমিটির আহ্বানে ২৫ জুলাই এসডিও দপ্তরে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কাটোয়া অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত তিন শতাধিক ছাত্রের সুসজ্জিত মিছিল স্টেশন রোড ও কাছারি রোড পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের অফিসে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখায়। পরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে ফি-বৃদ্ধির কালা সার্কুলার পোড়ানো হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, এ আই ডি এস ও কাটোয়া শহর লোকাল কমিটির পক্ষে কমরেডস্ অতীন বোস, সঞ্জিত ঘোষ ও আবুল হাসনাৎ প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড অনিরুদ্ধ কুণ্ডু।

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমতলা গ্রামের প্রবীণ এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড রবিশশী হালদার ২০ জুলাই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। ক্যানিং এলাকায় দল গঠনের প্রথম দিকে কমরেড হালদার দলের সঙ্গে যুক্ত হন। কংগ্রেসী জোতদারদের বিরুদ্ধে গরিব খেতমজুর, বর্গাদারদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বহুবার তিনি কারাবরণ করেন। আন্দোলনের পথ পরিক্রমায় তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীরূপে কয়েকবার জয়লাভ করেছেন। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আঞ্চলিক পার্টি নেতৃত্ব আমতলায় তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কমরেড রবিশশী হালদার লাল সেলাম

পাশ-ফেল প্রবর্তনের দাবিতে ২৫ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করছে বিপিটিএ

রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষানীতি শিক্ষার চূড়ান্ত সর্বনাশ করে চলেছে। দীর্ঘ আন্দোলনের পরে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তিত হলেও এখনও পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা চালু হয়নি। ফলস্বরূপ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে গেছে। শিক্ষার মানে একদা অগ্রগণ্য এই রাজ্য বর্তমানে সারা ভারতে ১৯তম স্থানে, মৌলিক শিক্ষায় ৩২তম স্থানে।

রাজ্যের ২১ লক্ষ শিশু এখনও স্কুলশিক্ষার আওতার বাইরে। অথচ সর্বশিক্ষা প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। সে টাকা কোথায় যাচ্ছে? প্রায় আড়াই হাজার গ্রামে কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছে রকেটের গতিতে। ৭৫ শতাংশ স্কুলছুট হয়ে যাচ্ছে। প্রায় ১০ হাজার স্কুলের ঘরবাড়ি ভগ্ন বা অর্ধভগ্ন। নতুন স্কুল তৈরি হচ্ছে না, শিক্ষকও বাড়ছে না। ৫০ হাজার শিক্ষকপদ শূন্য। ছাত্র ও শিক্ষকের অভাবে প্রায় আড়াই হাজার স্কুল উঠে গেছে। শিক্ষার সার্বিক চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। এ ছাড়া বৃত্তি পরীক্ষা চালু না হওয়ায় শিক্ষার উৎকর্ষ ও মেধা বিনষ্ট হচ্ছে। জানুয়ারি-ডিসেম্বর শিক্ষাবর্ষ চালু না হওয়ায় গ্রামবাংলায় স্কুলছুটের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। গত বছরও বিশাল শিশুমিছিল সহকারে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। এ'বছর গত ৬ মাস যাবত ব্যাপকভাবে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে। ইতিমধ্যে ২০ লক্ষাধিক স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে। সারা রাজ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং পথে নেমেও শিক্ষক-শিক্ষিকারা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন। ৫ সেপ্টেম্বর ২৫ লক্ষ গণস্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে।

জেলায় জেলায় প্রাথমিক শিক্ষকদের বিক্ষোভ

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে প্রাথমিক স্তরে অবিলম্বে পাশ-ফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তন, চতুর্থ শ্রেণীতে বৃত্তিপরীক্ষা, জানুয়ারি-ডিসেম্বর শিক্ষাবর্ষ পুনরায় চালু, শিক্ষকদের মাস-পয়লা বেতন ও পেনশন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ঠিকমত প্রদানের দাবিতে জেলায় জেলায় শিক্ষক বিক্ষোভ চলছে।

পুরুলিয়া ঃ ১৭ জুলাই উপরোক্ত দাবিগুলির ভিত্তিতে শিক্ষকরা মিছিল করে পুরুলিয়া জেলা সংসদ সভাপতির কাছে গণডেপুটেশন দেন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন জেলা সভাপতি কুশধ্বজ মণ্ডল, জেলা সম্পাদক অসীম ভট্টাচার্য, শেখর গরাই, সুমিতা মুখার্জী প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এফ ও না থাকায় দীর্ঘদিন যাবত শিক্ষকরা পেনশন পাচ্ছেন না। প্রায় ৫০০ পেনশন ফাইল জমে আছে।

মুর্শিদাবাদ ঃ ৩০ জুলাই শিক্ষকরা মিছিল সহকারে বহরমপুরে জেলা সংসদ সভাপতির কাছে গণডেপুটেশন দেন। বিশাল পুলিশবাহিনী দিয়ে শিক্ষকদের আটকে দেওয়া হলে প্রতিবাদে শিক্ষকরা অবস্থান বিক্ষোভ করেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন জেলা সভাপতি লক্ষণ দাস, সম্পাদক মোসাব্বর, আবুল হোসেন প্রমুখ।

কলকাতা ঃ ৩১ জুলাই কলকাতায় গড়িয়াহাটে ডি আই অফিসে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিক্ষোভ দেখান, মিছিল করে অফিসের মধ্যে দীর্ঘ সময় স্লোগান দেন। কলকাতায় দীর্ঘ ২ বছর যাবত শিক্ষকরা পিএফ লোন পাচ্ছেন না, অবসরপ্রাপ্তরা ফাইনাল পেমেন্ট পাচ্ছেন না। ১৩ বছর ধরে পিএফ-এর হিসাবও দেওয়া হচ্ছে না। ডি আই-এর অনুপস্থিতিতে এ আই স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। বিক্ষোভরত শিক্ষকদের সামনে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা, অন্যতম সম্পাদক অজিত হোড়, জেলা সভাপতি বীরেন দেব ও সম্পাদিকা তপতী মিত্র প্রমুখ।

কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন

পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির প্রয়োজনে কেন মার্কসবাদ অপরিহার্য

কলকাতায় ৫ই আগস্টের সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

(কমরেড প্রভাস ঘোষ ৫ই আগস্ট দু'ঘণ্টার বেশি সময় ধরে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, তার কয়েকটি অংশ সংক্ষেপে এখানে উপস্থিত করা হল।)

আমাদের মহান শিক্ষক, এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৩২তম স্মরণ দিবসে আজ এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের ১৯টি রাজ্যে জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩২টি বছর ধরে এইদিনে আমরা এই ধরনের সমাবেশের আয়োজন করে তাঁর প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আমরা স্মরণ করি তাঁর অমূল্য বৈপ্লবিক শিক্ষা এবং জীবনসংগ্রামের কিছু দিক, যাতে তাঁর ছাত্র হিসাবে তাঁর স্বপ্নকে সফল করার সংগ্রামে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। এখানে এসেছেন বহু গরিব চাষি, চাষের কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে। এসেছেন গরিব শ্রমিক, কারখানার কাজ একদিন বন্ধ রেখে, এসেছেন বহু ছাত্র-যুবক, শিশুসন্তান নিয়ে মায়েরা, এসেছেন মেদিনীপুরের বন্যাপীড়িতরা, যাঁদের রাস্তার ধারে ছাউনি বেঁধে থাকতে হয়, তাঁরাও। কীসের টানে এসেছেন তাঁরা? কেন এই প্রবল আবেগ? আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ২৯ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কমরেড সহ আরও অনেক বন্দিও এই মুহূর্তে জেলের অভ্যন্তরে সভায় মিলিত হয়েছেন। সদ্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত নদীয়ার ১৯ জন কমরেডও কৃষ্ণনগর জেলে কমরেড শিবদাস ঘোষকে স্মরণ করছেন। আমাদের দলের যে ১৫২ জন শহিদ সিপিএমের রাজত্বে পুলিশের গুলিতে, ওদের ক্রিমিনালদের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের বুকেও এই একই নাম ছিল — কমরেড শিবদাস ঘোষ। আমাদের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, প্রাক্তন মন্ত্রী কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী যখন মৃত্যুশয্যায়, কমরেড শচীন ব্যানার্জী যখন মৃত্যুশয্যায়, কমরেড প্রীতীশ চন্দ, কমরেড হীরেন সরকার, কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী, কমরেড তাপস দত্ত প্রমুখ নেতারা সহ আরও বহু কর্মীরা যখন মৃত্যুশয্যায় তখনও তাঁদের অন্তরে একটাই প্রশ্ন ছিল, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী কে কতটা লড়াই করতে পেরেছেন। যাঁর নাম কোনও জীবনীগ্রন্থে নেই, ইতিহাসে নেই, সংবাদমাধ্যমে নেই, কেন তাঁর নাম রয়েছে আমাদের বুকে? কেন তাঁর নামে ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে, ভারতবর্ষের বাইরেও বিভিন্ন দেশে বিপ্লবীরা সংগ্রামের শপথ নিচ্ছেন, অনুপ্রাণিত হচ্ছেন? এই কেন'র উত্তর রয়েছে কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষাবলীতে, অনন্যসাধারণ বিপ্লবী জীবনের সংগ্রামে। সাধারণ মানুষই বলেন, এস ইউ সি আই একমাত্র দল, যে একটা আদর্শ, একটা নীতি নিয়ে চলে; যে দলের কর্মীরা লাঠির মুখে, গুলির মুখে দাঁড়িয়ে বুকের রক্ত ঢেলে জনগণের জন্য লড়ে। শীতে-গ্রীষ্মে-বর্ষায়, ঝড়ে-ঝাপটায় এ দলের কর্মীরা যখন মিছিল-মিটিং-আন্দোলন করে, গুলির মুখে দাঁড়িয়েও লড়ে, তখনও এ দলের কর্মীদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা থাকে, একটা উন্নত চরিত্রের সুর থাকে। জনগণের মধ্যেও জিজ্ঞাসা — এই শক্তি, এই শৃঙ্খলার উৎস কী? এর উৎস মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ; তাঁর অসাধারণ বৈপ্লবিক জীবনসংগ্রাম, তাঁর মহান বিপ্লবী আদর্শ। ৫ই আগস্ট আমরা সমবেত হই প্রাণের আবেগে, অন্তরের অন্তস্তল থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার গভীর প্রেরণায়। আমরা যখন থাকব না, তখনও এই দিনটি উদযাপিত হবে, বছরে বছরে উদযাপিত হবে। মুক্তিকামী মানুষ, বিপ্লবী মানুষ ৫ই আগস্ট উদযাপন করবেন একই কারণে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষের, তথা গোটা পৃথিবীর মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথ প্রদর্শক, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক। কোনও চিন্তানায়ক, কোনও চিন্তা, কোনও আদর্শ, কোনও মহৎ চরিত্র হঠাৎ করে আসে না। সবই ইতিহাসের সৃষ্টি, যুগের সৃষ্টি। মানবসমাজের মুক্তির প্রয়োজনেই এ-সবের উদ্ভব। সুদূর অতীতে একটা সময়ে দাসপ্রথার যুগে ধর্মীয় আন্দোলনে যে সমস্ত ধর্মপ্রচারক বা ঈশ্বরবিশ্বাসী মনীষীরা এসেছিলেন, তাঁরাও সে যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নিয়েই এসেছিলেন। পরবর্তীকালে রাজতন্ত্রবিরোধী সংগ্রামের যুগে, যখন বণিকী সভ্যতা মাথা তুলে দাঁড়াল, যখন পুঁজিবাদী পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি মাথা তুলে দাঁড়াল, তখন যাঁরা জাতীয়তাবাদের এবং মানবতাবাদের ঝান্ডা নিয়ে এসেছিলেন, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির জয়গান গেয়ে এসেছিলেন, তাঁরাও সেই যুগের প্রয়োজনেই এসেছিলেন। তেমনি মার্কসবাদ ও মহান মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ — সকলেই এসেছেন যুগের প্রয়োজনে, পুঁজিবাদবিরোধী সর্বহারা বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজনে। আমাদের দেশে শিবদাস ঘোষও অতীতের বড় মানুষদের মতোই ইতিহাসের প্রয়োজনে ইতিহাসেরই সৃষ্টি। আবার তিনিও সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম স্রষ্টার ভূমিকা পালন করেছেন।

কমরেড প্রভাস ঘোষ

যথার্থ মনুষ্যত্বের সন্ধান দিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ

কমরেডস, আমরা সকলেই তাঁর কাছে অশেষ ঋণী। তিনি আমাদের নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শুধু নিজেরটা দেখা, টাকা-পয়সা রোজগার, ঘরবাড়ি নির্মাণ, আমোদ-ফূর্তিতে মত্ত থাকা— এ জীবন গোলামির জীবন, এ জীবন বিবেককে বিক্রি করার জীবন। বলেছেন দুটো জীবন আছে। একটা হচ্ছে এই প্রচলিত শোষণ ব্যবস্থার দাসত্ব কর, নিজেকে বিক্রি কর, গোলামি কর, ফূর্তি কর। বাস্তবে এ জীবন জন্তু জানোয়ারের জীবন। এ জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী? আর একটা জীবন বলে, শোষণ অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াও। এ জীবনে অনাহার আছে, জেল-হাজতে মৃত্যু আছে, গুলিতে-ফাঁসিতে মৃত্যু আছে। কিন্তু তার মধ্যেই আছে অশেষ আনন্দ। কী সে আনন্দ? আমি নিজেকে কারোর কাছে বিক্রি করিনি। আমি আত্মমর্যাদা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি যতদিন বেঁচেছি, মৃত্যুর সময়ও মাথা তুলে থাকব। এ কথাই তিনি এদেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ যুবক, লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী, নারী-পুরুষের সামনে উপস্থিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ইজ্জত হারিয়ে, বিবেক বিক্রি করে, মনুষ্যত্ব হারিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী? এ বাঁচা বাঁচা নয়। এ বাঁচা মৃত্যুর তুল্য। তাঁর এই শিক্ষাই আমাদের ঘর ছাড়িয়েছে। আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।

আপনারা অনেকেই জানেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন কৈশোরে ঘর ছেড়েছেন তখন ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের যুগ। সে যুগে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল— এই এক অধ্যায়, নবজাগরণের অধ্যায়। নবজাগরণের মধ্যে ছিল আপসহীনতা ও আপসমুখীনতা। একটা ধারা পুরনো সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা, ধর্মীয় চিন্তা ও কূপমণ্ডুকতার সাথে আপস করেই মানবতার বাণী উচ্চারণ করেছিল। আরেকটা ধারা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত, সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারমুক্ত, কূপমণ্ডুকতামুক্ত পার্থিব মানবতাবাদের বাণী তুলে ধরেছিল। অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলনেও ছিল একদিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে আবেদন-নিবেদন, পিটিশন, অনশন, অবস্থান, অহিংস আন্দোলনের আপসমুখী সংস্কারপন্থী ধারা। আর একটা ধারা ছিল সশস্ত্র বিপ্লববাদ — লড়াই করে প্রাণ দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে স্বাধীনতা অর্জন। এই যুগেই কমরেড শিবদাস ঘোষ আপসহীন নবজাগরণের ধারা এবং সশস্ত্র বিপ্লবী ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁর কৈশোরেই। অসংখ্য কিশোর ভারতবর্ষের বুকে তখন ঘর ছাড়ছিলেন। তিনিও ঘর ছেড়েছিলেন। এই পথে চলতে চলতেই ১৯৪০ সালে তাঁর সাথে যোগাযোগ হয় এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মতাদর্শ মার্কসবাদের। পরবর্তীকালে এই মার্কসবাদকেই তিনি মুক্তিসংগ্রামের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন।

মানবতাবাদীরাও সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে স্বাগত জানান

কেন তিনি মার্কসবাদকে গ্রহণ করলেন? এদেশে অন্যান্য মতাদর্শ বা চিন্তাধারা ছিল। বেদ-বেদান্ত ছিল, বিবেকানন্দের চিন্তা ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ছিল, এদেশে গান্ধীজির চিন্তাও ছিল। এঁরাও বড় মানুষ ছিলেন। তবুও কেন তিনি মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছিলেন? এই বিষয়ে আমি কিছুটা আলোচনা করতে চাই এই জন্য যে, আজকে অত্যন্ত সংগঠিতভাবে, পরিকল্পিতভাবে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চালানো হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে, লেখায়, আলোচনায় আক্রমণ চলছে। মার্কসবাদের পথপ্রদর্শক, বিশ্ববন্দিত নেতা মার্কস-এঙ্গেলস, পরবর্তী অধ্যায়ে লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুং — এঁদের বিরুদ্ধে কুৎসার অভিযান চালানো হচ্ছে। চালাচ্ছে কারা? চালাচ্ছে বিপ্লবভীত শোষক বুর্জোয়াশ্রেণী। আক্রমণ চালাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়াদের টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবী নামে বুদ্ধিভ্রষ্ট একদল সাংবাদিক এবং লেখক। সৎ কিন্তু হতাশাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যেও মার্কসবাদ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের ফলে। আমি তাঁদের কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। যাঁরা আজকাল নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে দাবি করেন, তাঁরা কি জানেন, তাঁরাও যাঁকে শ্রদ্ধা করেন, সেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রই একদিন বলেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দিতে জার্মানির শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে মার্কসবাদ। এই সুভাষ বসুই বলেছিলেন, বিংশ শতাব্দিতে মানবজাতির সামনে নতুন সভ্যতা এনেছে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সর্বহারা রাষ্ট্র, সর্বহারা সংস্কৃতি। সুভাষ বসু কি বুদ্ধিজীবী ছিলেন না? তাঁরা কি জানেন, স্ট্যালিন যখন রাশিয়ার কর্ণধার, রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়ে বলেছিলেন — আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, রাশিয়া ১০-১৫ বছরে হাজার হাজার বছরের ইতিহাসকে পরিবর্তন করছে। বলেছিলেন, ফরাসী বিপ্লব যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ধ্বনি তুলেছিল, কিন্তু কার্যকর করতে পারেনি, রাশিয়া তাকে কার্যকর করার চেষ্টা করছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন একমাত্র রাষ্ট্র যে মানবজাতির সামনে বলছে, সমস্ত অস্ত্র ধ্বংস কর, যা আর কোনও দেশ বলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মার্কসবাদী ছিলেন না। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় তখন গোটা বিশ্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসকাণ্ড চলছে। জার্মানি, ইটালি, জাপান মানবসভ্যতাকে বিপন্ন করছে। রোগশয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথ প্রশান্ত মহলানবিশকে জিজ্ঞাসা করছেন, সোভিয়েত লালফৌজ কতদূর এগোচ্ছে। এখনকার বুদ্ধিজীবীরা কি জানেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল একমাত্র ভরসা। শরৎচন্দ্র সমাজতন্ত্রের জয়গান গেয়েছেন। প্রেমচাঁদ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছিলেন, নজরুল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছিলেন। শহীদ ই-আজম ভগৎ সিং-কে ফাঁসি যাওয়ার আগের মুহূর্তে বলা হয়েছিল গীতা পাঠ কর। ভগৎ সিং বললেন, আমি তা পাঠ করেছি। সে গীতা হল লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'। এঁরা কি বড় মানুষ ছিলেন? এঁদের কি বুদ্ধি ছিল? এমনকী ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর কথা ধরুন। স্ট্যালিন যেদিন মারা যান, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক হয়েও নেহেরু বলেছিলেন, আমরা গর্বিত যে স্ট্যালিনের যুগে আমাদের জন্ম। আজ সেই স্ট্যালিনকে নিয়ে প্রায় প্রতিদিন কাগজে নানা কুৎসিত আলোচনা চলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন রুজভেল্ট ও চার্চিল স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক বার্নার্ড শ বললেন, দু'জন রাখাল বালক দেখা করছে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদের সাথে। রাখাল বালকরা হচ্ছেন রুজভেল্ট ও চার্চিল। কে বলছেন? বার্নার্ড শ। বার্নার্ড শ, রমাঁ রলাঁ, আইনস্টাইন এঁরা কি বুদ্ধিজীবী ছিলেন? এঁরা কেউ মার্কসবাদী ছিলেন না। কিন্তু নতুন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতসভ্যতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রমাঁ রলাঁ তো শেষ জীবনে মার্কসবাদ গ্রহণ করেছিলেন! তিনি বলেছিলেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র যদি কোনও দিন ধ্বংস হয়, শুধু রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী শৃঙ্খলিত হবে তাই নয়, মানবসভ্যতাও অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে, যা আজ দেখা যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদী আন্দোলনের যাঁরা পুরোধা ছিলেন, আমাদের দেশের স্বদেশী আন্দোলনের যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের চিন্তার মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। অথচ আজকাল, বুদ্ধি বিক্রি করে খায় এমন কিছু বুদ্ধিজীবী প্রতিদিন আক্রমণ চালাচ্ছে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে, মহান নেতাদের বিরুদ্ধে। গোটা দুনিয়া বলেছে, মহান স্ট্যালিন না থাকলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করা যেত না। সুভাষ বসু যখন পরাস্ত, তখনও আজাদ হিন্দ বাহিনীর লোকদের ভরসা দিয়ে বলেছেন, এখনও একটি মানুষ বেঁচে আছেন, তিনি জোসেফ স্ট্যালিন, বিশ্বের আগামী কয়েক যুগ তাঁর ওপর নির্ভর করছে। এবং শেষ মুহূর্তে সুভাষ বসু ঐ সোভিয়েত ইউনিয়নেই যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

এই মার্কসবাদকেই কমরেড শিবদাস ঘোষ গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, সত্যানুসন্ধান কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনের ব্রত ছিল। সমাজ শোষক-শোষিতে বিভক্ত, পুঁজিপতি-শ্রমিক, জোতদার-খেতমজুর — এই যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, যেখানে অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু আছে, লুণ্ঠন-অত্যাচার-জুলুম আছে, নারীর উপর পুরুষশাসিত সমাজের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আছে, তার হাত থেকে সমাজ-সভ্যতাকে কী করে বাঁচানো সম্ভব, এই ছিল তাঁর সামনে মূল প্রশ্ন। স্বাধীনতা মানে তো শুধু এ নয়, ব্রিটিশ শাসনের অবসান হোক এবং তার পরিবর্তে ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণী শোষণ-লুণ্ঠন চালাক— যেটা এখন চলছে। এই স্বাধীনতা কমরেড শিবদাস ঘোষ চাননি। যথার্থ শোষণমুক্তির পথ কোথায়? এই পথ

চারের পাতায় দেখুন

মার্কসবাদকে ভারতের মাটির সঙ্গে একাত্ম করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ

তিনের পাতার পর

খোঁজার জন্যই সত্যানুসন্ধান। এই সত্যানুন্ধানের পথেই তিনি বিচার করে দেখেন যে, এদেশের বেদ-বেদান্ত, ধর্মীয় চিন্তা, মানবতাবাদ, গান্ধীবাদের মাধ্যমে সমস্যার কোনও সমাধান নেই।

ঈশ্বরবিশ্বাস সম্পর্কে মার্কসবাদীদের দৃষ্টিকোণ কী

এখানে আমি আর একটা কথা বলতে চাই। আমরা কমিউনিস্ট, মার্কসবাদী, আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত — বিরোধীরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, আমরা ধর্ম মানি না, ঈশ্বর মানি না। ধর্ম ও ঈশ্বর না মানলে নাকি কোনও কল্যাণ হতে পারে না। একথা সত্য যে, ধর্মীয় বিশ্বাস, ঈশ্বর বিশ্বাসের সাথে মার্কসবাদীদের, কমিউনিস্টদের চিন্তার পার্থক্য আছে। এ সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা যা বুঝেছি সেটা আমি পরে আপনাদের বলব। তার আগে বলতে চাই, আমরা মার্কসবাদীরা ঈশ্বরবিশ্বাসকে আঘাত করার অনেক আগে তাকে আঘাত করেছিল বুর্জোয়ারাই। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ইউরোপে যখন সংঘটিত হয়, সেই সময় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে লড়াই, ফ্রান্সের ফরাসি বিপ্লব, ইংল্যান্ডের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন, জার্মানির পেজেন্ট ওয়ার, যা দিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির সূচনা— সেই অধ্যায়ে যাঁরা নায়ক ছিলেন, পুরোধা ছিলেন, নবজাগরণের যাঁরা পতাকাবাহী ছিলেন, তাঁরা কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। বাইবেলের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরচিন্তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এটাই ইতিহাস। ভলটেয়ার, দিদেরো, বেকন, বেনথাম, হিউম, মিল, কান্ট, স্পিনোজা, ফুয়েরবাখ আরও অনেকে— এঁরা কেউই মার্কসবাদী ছিলেন না। এঁরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরবিশ্বাসকে আঘাত করেছেন। সেই যুগের রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অনেকেই আঘাত করেছেন। কারণ সেদিনকার রাজতন্ত্র দাঁড়িয়েই ছিল ঈশ্বরবিশ্বাসকে ভিত্তি করে। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁর শাসন ঈশ্বরের শাসন। রাজার বিরুদ্ধে যাওয়া মানে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাওয়া। ফলে রাজার অত্যাচার, সামন্ততন্ত্রের শোষণ অত্যাচার মেনে নাও। ধর্মের নামে এই চলছিল।

আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর। তিনি কি মার্কসবাদী ছিলেন? এ দেশে এমন কোনও মানুষ নেই বিদ্যাসাগরের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে না। সেই বিদ্যাসাগরই তো বলেছিলেন, সাংখ্য-বেদান্ত মিথ্যা, ধর্মীয় শাস্ত্র মিথ্যা, এর মধ্যে আজ আর সত্য পাওয়া যায় না। ইউরোপ থেকে এমন বই এনে পড়াও যাতে এদেশের যুবকদের ধর্মীয় ভ্রান্তি দূর হয়। রামকৃষ্ণ তাঁর বাড়ি গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর যাননি। কারণ, তিনি মন্দির মসজিদে যেতেন না। বিশ্বাস করতেন না। এই নিরীশ্বরবাদী বিদ্যাসাগর সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধায় বলেছিলেন 'অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব'। নবজাগরণ বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, তার সূচনাই হয়েছিল ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে লড়াই করার দ্বারা। এই ইতিহাস কেউ অস্বীকার করতে পারবে? বরং মার্কস থেকে শুরু করে শিবদাস ঘোষ বিজ্ঞানের সাহায্যে ইতিহাস বিচার করে দেখিয়েছেন যে, ধর্ম একদিন এসেছিল মানবসভ্যতার প্রয়োজনে, মানুষের কল্যাণে। দাসপ্রথার যুগে ঈশ্বরচিন্তা না থাকলে, সমাজে নীতি-নৈতিকতা থাকত না, দায়িত্ববোধ, পাপ-পুণ্যবোধ থাকত না। এই হল কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য। মার্কসও বলেছিলেন, অত্যাচারিত মানুষের চোখের জল ও দীর্ঘনিঃশ্বাস থেকে ধর্মের সৃষ্টি। ধর্মীয় প্রতিবাদ হল অত্যাচারিত মানুষের প্রতিবাদ। শেষে বললেন, ধর্ম মানুষের জীবনে আফিংয়ের মতো। আফিংয়ের প্রভাব থাকলে যেমন ব্যথার অনুভূতি থাকে না, ধর্মীয় চিন্তার কাছে আত্মসমর্পণ করলে, মানুষ ইহকালের দুঃখ-ব্যথা ভুলে গিয়ে কাল্পনিক পরলোকের কথা ভাবে।

বিবেকানন্দের চিন্তা দিয়ে কেন আজ মুক্তি আসবে না

কমরেড শিবদাস ঘোষ অতীতের সমস্ত বড় মানুষদের মতোই ধর্মপ্রচারকদেরও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের জীবন থেকেও তিনি শিক্ষা নিয়েছেন। আবার তিনিই বলে গিয়েছেন, ধর্মীয় চিন্তার দ্বারা আজ আর মুক্তি নেই। কেন মুক্তি নেই? ধর্মীয় শিক্ষা কী বলে? ধর্মীয় শিক্ষা বলে গোটা পৃথিবী, গোটা বিশ্বপ্রকৃতি, মানবসমাজ, সবই ঈশ্বরের, আল্লা বা গডের সৃষ্টি। তাঁর বিধানেই সবকিছু চলে, তাঁর ইচ্ছাই কর্ম। ফলে ধনী-গরিবও ভগবানের সৃষ্টি। অতএব শোষক-শোষিত, ধনী-গরিব থাকবেই। জন্মান্তরবাদ বলে, ধনী হওয়া পূর্বজন্মের পুণ্যের ফল, গরিব হওয়া পাপের ফল। মনে রাখবেন, এই যে ধর্মীয় চিন্তা, এর বিরুদ্ধে প্রথম লড়েছিল কিন্তু বুর্জোয়ারাই, যখন তারা প্রগতির ও বিপ্লবের ঝাণ্ডা বহন করেছে। খানিকটা লড়াই করার পর, পুঁজিবাদ কায়েম হওয়ার পর, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যখন শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম-আন্দোলন শুরু হল, তখন সেই ধর্মকেই আবার বুর্জোয়ারাই আঁকড়ে ধরল, আশ্রয় করল। আজকেও তারা সেটাকে কাজে লাগাচ্ছে। সত্যানুসন্ধানে ধর্মীয় চিন্তাকে গ্রহণ করলে কী বিপত্তি ঘটে দেখুন। আমাদের দেশের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, সে যুগের অত্যন্ত বড় মানুষ ছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণে বেদান্তকে গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে আমরা দেখি, এক বিবেকানন্দ যিনি একজন বড় মানবতাবাদী, তিনি বলছেন ক্ষুধার্ত মানুষের ভগবান নেই, মন্দির-মসজিদ-গির্জা নেই। আগে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান কর। আগে খাদ্য চাই, তার পর ভগবান। তিনি বলছেন, যে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ মহুয়া গাছের ফুল খায়, যে দেশে কিছু সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ এদের রক্ত শোষণ করে, সে দেশ কি দেশ, না নরক! সেটা কি ধর্ম না প্রেতের নৃত্য! এ এক বিবেকানন্দ। আর এক বিবেকানন্দ বৈদান্তিক নৈতিকতা ব্যাখ্যা করে বলছেন, যে তুমি ক্ষুধার্ত, রাস্তায় ভিক্ষা করছ, সেই তুমিই রাজপ্রাসাদে বাস করছ। যে তুমি অশিক্ষিত, সেই তুমিই শিক্ষিত। যে তুমি আঘাত করছ এবং যাকে আঘাত করছ, উভয়ের মধ্যেই এক ব্রহ্ম বিরাজমান। ফলে রাজপ্রাসাদে যে আছে, তার মধ্যে ব্রহ্ম আছে, আর রাস্তায় যে ভিক্ষা করছে, তার মধ্যেও ব্রহ্ম আছে অর্থাৎ এই ব্রহ্ম ধারণা অনুযায়ী আমি যখন না খেয়ে আছি, সেই আমিই তখন রাজপ্রাসাদে খাদ্যগ্রহণ করছি; যে আমি অশিক্ষিত, সেই আমিই শিক্ষা অর্জন করছি। আমাদের সকলের মধ্যে একই ব্রহ্ম। ফলে ধনী-গরিব পার্থক্য, অত্যাচারী-অত্যাচারিতের পার্থক্য হচ্ছে বলে যা দেখছি তা ভুল, মায়া। বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। এক ব্রহ্মকেই আমরা মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ভুল করে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখছি। এই বিবেকানন্দই বলছেন, এক ব্রহ্ম থেকেই সবকিছু আসে। তিনি হচ্ছেন মহৎ। এই মহৎ থেকেই এসেছে প্রাণ ও আকাশ। প্রাণ মানে ভাইব্রেশন, যা স্পন্দন জাগায়, আকাশ মানে বস্তু। প্রথমে এরা খুবই 'ফাইনার' বা সূক্ষ্ম থাকে, আবার পরস্পরের সংস্পর্শে এসে ক্রমাগত বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে থাকে। এভাবেই সমগ্র প্রকৃতিজগৎ, প্রাণীজগৎ, মানুষ সবকিছু এসেছে ইভোলিউশন বা বিবর্তনের পথে, একইভাবে ইনভোলিউশন বা অনুবর্তনের পথে আবার ফাইনার হতে হতে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বারবার রিপিট হচ্ছে। এটাই সৃষ্টি, বিকাশ, লয়। ফলে নতুন কিছু হচ্ছে না। সবই পূর্বনির্ধারিত বা প্রিডিটারমাইন্ড। তার ফলে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সত্য বাইরে নেই, সত্য অন্তরে, আত্মাই পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম। তাকে জানাই পরমজ্ঞান অর্জন। তাই বললেন, শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ। বললেন, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বাইরের আপেল পড়া দেখে আবিষ্কার করেননি। কারণ এই তত্ত্ব তাঁর অন্তরে আগের থেকেই ছিল, আপেল পড়ায় অন্তরে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তার ফলে এই তত্ত্ব উদভাসিত হয়। এই বিবেকানন্দই ইউরোপে গিয়ে তৎকালীন সমাজতন্ত্রের কথা শুনে এসেছিলেন। যার জন্য বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ শাসন, ক্ষত্রিয় শাসন, বৈশ্য শাসন, তার পর আসবে শূদ্র শাসন। কিন্তু কোনওটাই দাঁড়ায়নি। কারণ তাঁর চিন্তায় সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত, নতুন কিছু আসে না, আসবে না। একবার ব্রহ্ম বা মহৎ থেকে সব আসছে, আবার তার মধ্যে সবকিছু বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সবকিছুই যেহেতু এক ব্রহ্ম, তাই জগতে যা কিছু পার্থক্য দেখা হয়, সবই ভুল, সবই মায়া। এই চিন্তার দ্বারা পুঁজিবাদী শোষণ থেকে সমাজমুক্তি কি সম্ভব? যদিও তিনি অসাধারণ বড়ত্বের অধিকারী ছিলেন এবং এদেশের জাতীয়তাবাদী যৌবনকে জাগাতে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যানুসন্ধানে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে না পারায় এই বিপত্তি ঘটল।

গান্ধীজির চিন্তা নিয়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়া যাবে না

আবার দেখুন, গান্ধীজি বলছেন, সমাজে দু'টি শক্তি। একটা বুদ্ধির শক্তি, একটা শ্রমের শক্তি। বলছেন, আমি পুঁজিপতি এবং শ্রমিক বলতে বুঝি — পুঁজিপতি হচ্ছে বুদ্ধির শক্তি, শ্রমিক হচ্ছে পরিশ্রম করার শক্তি। এই পার্থক্য চিরন্তন, চিরদিন থাকবে। পুঁজিপতি, শ্রমিক চিরদিন থাকবে। গান্ধীজি বলছেন, সমাজতন্ত্র অত্যন্ত সুন্দর কথা। আমিও সমাজতন্ত্রের ভক্ত। এরপর গান্ধীজি একটা তুলনা টেনে বলছেন, মাথা শরীরের উপরে থাকে, আর পায়ের তলা থাকে মাটি স্পর্শ করে। দুটোই শরীরের অংশ। মাথা উপরে থাকে বলেই এটা সবচেয়ে উচ্চ, আর পায়ের তলাটা সবচেয়ে নীচে — তা নয়, দুই-ই এক শরীরের অংশ। এই সমাজে রাজা-প্রজা, মালিক-শ্রমিক, জমিদার এবং ভূমিদাস — সবাই একই সমাজের অংশ। কিন্তু সকলেই সমান। গান্ধীজি মানবতাবাদী মূল্যবোধের কথা বলতেন। বুর্জোয়া মানবতাবাদ, সেক্যুলার হিউম্যানিজম যাকে আমরা বলি, ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মানবতাবাদের যে নৈতিকতা ফুয়েরবাখ নির্ধারণ করেছিলেন, সেই নৈতিকতা কী? তিনি বলেছিলেন, মানুষে মানুষে সম্পর্ক হবে ভালবাসার। প্রত্যেকের নিজের ক্ষেত্রে থাকবে র‍্যাশনাল রেস্ট্রেনমেন্ট, অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত আত্মসংযম, আর অপরের প্রতি থাকবে ভালবাসা। এই হচ্ছে ফুয়েরবাখের মানবতাবাদ। গোটা বুর্জোয়া দুনিয়ায় এই মানবতাবাদের জয়গানই চলছে। ফুয়েরবাখ মানুষকে মালিক-শ্রমিক, ধনী-গরিব হিসাবে দেখেননি। তাঁর কাছে সব মানুষ এক। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বলছেন, নিজের জন্য ন্যায়সঙ্গত আত্মসংযম, আর অপরের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা। মার্কস বললেন, এঙ্গেলস বললেন, এই ভালবাসাই তো চলছে কলে-কারখানায় সমস্ত জায়গায়। প্রত্যেক মালিকই বলছে, সে যা মুনাফা অর্জন করছে, তার দ্বারা ন্যায়সঙ্গত আত্মসংযম চর্চা করছে। আর শ্রমিককে যা মজুরি দিচ্ছে, সেটা ভালবাসারই প্রকাশ। এদেশে গান্ধীজিও সেই একই কথাই বলছেন। গান্ধীজি পুঁজিপতিদের বলছেন, প্রত্যেকে নেবে তোমার ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত প্রাপ্য। আর বাকিটা শ্রমিককে, জনগণকে দেবে। কোন মালিক বলে, সে অন্যায় নিচ্ছে, অযৌক্তিক নিচ্ছে! কীসের ভিত্তিতে এই ন্যায়ের মানদণ্ডটিক হবে? গান্ধীজির মতো বড় মানুষও এই প্রশ্নে আটকে গেলেন। কারণ তাঁর কাছে সত্য শাশ্বত, সনাতন, সবকিছু স্বর্গীয় শাসন, ভগবানের শাসন। মালিক-শ্রমিক ভগবানের সৃষ্টি। মালিকদের বলছেন, এ সম্পত্তি তোমার নয়, ভগবানের। মালিক হচ্ছে ট্রাস্টি। গান্ধীজি শ্রমিকদের বলছেন, মালিকদের উচ্ছেদ করলে সমাজে বুদ্ধির শক্তি থাকবে না। ফলে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার কথা বলবে না। আবার পুঁজিপতিদের বলছেন, শ্রমিকের খাওয়া না থাকলে পরিশ্রম করবে কে? ফলে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক হবে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। এই হচ্ছে গান্ধীজির চিন্তা। এর দ্বারা শোষিত জনগণের মুক্তি কি আসবে? আসেওনি। বরং বুর্জোয়ারা চরম শোষণ-লুণ্ঠন চালাচ্ছে।

রবীন্দ্রচিন্তাও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি নয়

আরেকজন মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথও বড় মানুষ ছিলেন। খুব দুঃখ করে তিনি বলছেন, সভ্যতায় একদল পিলসুজের মতো মাথার উপরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে, তাদের গা বেয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে; কিন্তু তারা আলো পায় না; এরা না খেয়ে, না পরে, বিনা চিকিৎসায় মরে, এবং এরাই সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আবার তিনিই বলছেন, এরকম একদল নিচুতলায় না থাকলে, সভ্যতা থাকবে না। কারণ উপরে না থাকলে বহু দূর দেখা যায় না, একদল তলায় থাকলে আরেক দল উপর থেকে দেখতে পারে। বলছেন, সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। একদিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যথা বেদনায় বলছেন, এরাই সবচেয়ে পরিশ্রম করে, এরাই বিনা চিকিৎসায় মরে, অন্যদিকে তিনিই আবার বলছেন, যারা শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর এবং মনের গতিকে নিচুতলায় কাজ করার যোগ্য ও বাধ্য। লক্ষ্য করুন, বাস্তব অবস্থাকে শুধু দায়ী করছেন না, বলছেন শরীর এবং মনের গতিকে অর্থাৎ তাদের দেহ এবং মনটাই এরকম যে তারা নিচুতলায় কাজ করার যোগ্য ও বাধ্য। এখানে 'যোগ্য ও বাধ্য' কথাটাও লক্ষ্য করবেন। এরপর বলছেন, আমি শুধু ভেবেছি তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সুখ-সুবিধা কতটা দেওয়া যায়। আর বলছেন, ব্যক্তির সম্পত্তি ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের ভাষা। ফলে ব্যক্তি-মালিকানা থাকবে। কিন্তু ব্যক্তিমালিক নিজের ন্যায্য প্রাপ্য নেবে, বাকিটা পরকে দেবে। সেই একই বুর্জোয়া মানবতাবাদের কথা। তাঁর কাছেও মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক চিরন্তন। মালিক ন্যায়সঙ্গত মুনাফা নেবে, শ্রমিককে ভালবাসা হিসাবে মজুরি দেবে এই যে মানবতাবাদী চিন্তা, এর মধ্য দিয়ে পুঁজির শোষণ-শাসন থেকে মুক্ত সমাজের কথা ভাবা যায় কি?

বিজ্ঞান বলেই মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ

মার্কস চেয়েছেন বলেই মার্কসবাদী দর্শন বিশ্বে আসেনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ চেয়েছেন বলেই তিনি সর্বহারার মুক্তি সংগ্রামের পথ প্রদর্শক হননি। এটা ইতিহাসের প্রয়োজন। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, যেকোনও চিন্তানায়ক একটা যুগের সৃষ্টি। বুদ্ধের যুগে সুভাষ বসুর অভ্যুদয় সম্ভব ছিল না। কলিদাসের যুগে রবীন্দ্রনাথ সম্ভব ছিল না। আবার এযুগে বুদ্ধ সম্ভব নয়, যেমন শঙ্করাচার্যের যুগে আইনস্টাইন সম্ভব নয়, আইনস্টাইনের যুগে শঙ্করাচার্য সম্ভব নয়। কারণ বিজ্ঞানে হোক, দর্শনে হোক, সব ক্ষেত্রেই কোনও চিন্তা আসার পিছনে তার অনুকূল সামাজিক পরিবেশ চাই। একটা বিশেষ যুগে বিশেষ পরিবেশে, সেই পরিবেশের সাথে ব্যক্তিমস্তিষ্কের ঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে চিন্তার বিকাশ ঘটে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, মার্কসের আগে যত চিন্তানায়ক, যত দার্শনিক এসেছেন তাঁরা নিজ নিজ যুগে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তাঁদেরও ইতিহাসে ভূমিকা ছিল, কিন্তু তাঁদের চিন্তা ছিল ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধি অর্থাৎ তিনি যা মনে করছেন সৎ মনে, সৎ বিশ্বাস নিয়ে, সেটাই তিনি দর্শন বা চিন্তাধারা

পাঁচের পাতায় দেখুন

কেন সিপিআই-সিপিএম যথার্থ মার্কসবাদী দল হতে পারল না

চারের পাতার পর

হিসাবে বলেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, যেকোনও চিন্তার পিছনে দু'টি জিনিস কাজ করে। একটা হচ্ছে সেই বিশেষ সময়ের সমাজ পরিবেশ অর্থাৎ সেই বিশেষ সময়ের উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্র কী এবং সেই সমাজের দ্বন্দ্ব সংঘাতের বৈশিষ্ট্য কী, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ হলে বিবদমান শ্রেণীগুলি কী কী প্রভৃতি। দ্বিতীয় জিনিসটা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ সমাজ ও ঘটনাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি বিচার করছেন। যত বড় চিন্তানায়কই হোন, এই সীমার বাইরে তিনি যেতে পারেন না। মার্কসের আগে অন্য চিন্তানায়করা যা পাননি, পাওয়া সম্ভব ছিল না, সেটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। বুর্জোয়া শিল্পবিপ্লবকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানের যেসব নতুন নতুন আবিষ্কারগুলি ঘটেছিল, সেগুলিকে ভিত্তি করে মার্কস পেলেন এক নতুন বিচার ধারা — যা এর আগে মানবজাতির সামনে আসেনি। আধুনিক বিজ্ঞান আসার পরে বিশ্বজগৎকে বিচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান একটা নতুন হাতিয়াররূপে এলো। একটা বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রমাণ, তার ভিত্তিতেই বিচার। জল কী, বিদ্যুৎ কী, পরীক্ষা করে যা পাওয়া গেল সেটাই সত্য। জলের ধর্ম, বিদ্যুতের নিয়ম যা জানা গেল, সেটা বিশ্বের সকল দেশের ক্ষেত্রে একই রকম। বিদ্যুৎ নিয়ে এক এক দেশ এক একভাবে চলতে পারে না। আমেরিকা যে নিয়মে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেই একই নিয়মে ভারতবর্ষ চীন রাশিয়া সকলেই করে। পরমাণু কী, সে বিষয়ে সকল দেশের সিদ্ধান্তই এক। এদেশের কেমিস্ট্রি ওদেশের কেমিস্ট্রি, এদেশের ফিজিক্স ওদেশের ফিজিক্স — কোনও পার্থক্য নেই। বিজ্ঞানের নিয়ম বিশ্বজনীন। মার্কসের অবদান হচ্ছে, তিনি এই বিজ্ঞানকেই দর্শনের জগতে, সবকিছু প্রশ্নে সত্যানুসন্ধানের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এজন্যই কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনিও এদেশে নবজাগরণের ধারাবাহিকতায় এসেছেন, স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লববাদের ধারবাহিকতায় এসেছেন, পরবর্তীকালে তিনি মার্কসবাদের সংস্পর্শে আসেন। এ কথাও আপনাদের জানা দরকার, প্রথম যুগে এদেশে মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করার ক্ষেত্রে স্বয়ং বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিরাট অবদান আছে। তিনি কিন্তু বিবেকানন্দের পথ নেননি। পরবর্তী কালে তিনি মার্কসবাদকেই গ্রহণ করেছিলেন।

মার্কসই প্রথম বস্তুবাদের কথা বলেছেন, তাও নয়। বস্তুবাদী চিন্তার অস্তিত্ব হাজার হাজার বছর পূর্বে থেকেই ছিল। বরং বলা ভাল প্রথম থেকেই ছিল। ইতিহাস বলে, আদিম সমাজে অতিপ্রাকৃত কোনও ঐশ্বরিক চিন্তা ছিল না, থাকার বাস্তব পরিস্থিতি ছিল না, কারণ তখন সম্পত্তি আসেনি, মালিকানা আসেনি, শ্রেণীবিভাগ আসেনি, প্রভু ও দাস আসেনি। ফলে বিশ্বপ্রভুর চিন্তাও আসেনি। তখন মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে জয় করার জন্য মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে তাদের বশীভূত করার চেষ্টা করেছে। মার্কসের আগে হাজার হাজার বছর পূর্বে বস্তুবাদের চিন্তা এসেছে। গ্রিসে থালেস, হেরাক্লিটাস, ডেমোক্রিটাসরা সেই যুগেই বস্তুবাদের চর্চা করেছিলেন। বর্তমানে ভারত বলে পরিচিত এই ভূখণ্ডেও অতীতে চার্বাক, বৃহস্পতিরা বস্তুবাদের চর্চা করেছিলেন। চতুর্ভূত অর্থাৎ মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি, এই চারটি বস্তু থেকেই সমগ্র প্রকৃতিজগৎ এসেছে —এইসব চিন্তা সেদিন ছিল। এখানে বস্তুবাদ, লোকায়ত দর্শনের ব্যাপক চর্চা ছিল। শাসনবেদ উপনিষদ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ছান্দোগ্য উপনিষদে বস্তুবাদী চিন্তার উল্লেখ আছে। ফলে যারা প্রচার করেন, ভারতবর্ষে শুধু অধ্যাত্মবাদের চর্চা হয়েছে, তাদের বক্তব্য অনৈতিহাসিক, ভ্রান্ত। এমনকী 'ভগবান বুদ্ধ' বলে যাঁকে বলা হয়, যিনি অসাধারণ বড় মানুষ ছিলেন, তিনি নিজেও বেদ ভগবান, স্বর্গ, নরক বিশ্বাস করতেন না। পরবর্তীকালে অধ্যাত্মবাদ শক্তিশালী হয়, রাজতন্ত্রও তাকে শক্তিশালী করে। এর বিরুদ্ধেই বিদ্যাসাগরকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও অজ্ঞেয়বাদকে হাতিয়ার করে লড়তে হয়েছে। এদেশের বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকবিপ্লবের ভয়ে যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবের বিরুদ্ধতা করেছে, আপস, আবেদন-নিবেদনের পথে গেছে, তেমনই সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে আপস করেছে। যার পরিণতিতে দেশভাগ হয়েছে এবং আজও ধর্ম-জাতপাতের বিদ্বেষের আগুন জ্বলছেই।

কেন সিপিআই সিপিএম যথার্থ মার্কসবাদী দল হতে পারল না

যাই হোক, যে সময় কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন, সেই সময় এদেশে অবিভক্ত সিপিআই ছাড়াও মার্কসবাদকে আদর্শ করে আরও অনেক দল ছিল। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সি পি আই গঠন করেন। এম এন রায় প্রথম দিকে সিপিআই গঠনে ছিলেন, পরে গঠন করেছিলেন ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লববাদী সংগঠন অনুশীলন সমিতি, যার সঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষ ছিলেন, তার নেতারাও তখন মার্কসবাদকে ভিত্তি করে আর এস পি দল গঠন করতে চলেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষও সেই প্রয়াসে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাথে নেতাদের দল গঠনের পদ্ধতিগত প্রশ্নে মতবিরোধ ঘটল। তিনি বললেন, মার্কসবাদকে একটা অর্থনৈতিক শাস্ত্র, একটা রাজনৈতিক শাস্ত্র হিসাবে নয়, জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। বললেন, আমরা সকলেই বুর্জোয়া সংস্কৃতি, সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাবে গড়ে উঠেছি, জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় গড়ে উঠেছি। সেই আমরা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিনের কিছু বই মুখস্থ করে কমিউনিস্ট হতে পারি না। মার্কসের বিখ্যাত উক্তি — যে শ্রমিক বিপ্লব করবে তাকে আগে নিজেকে পাল্টাতে হবে। শ্রমিক আগে নিজেকে পাল্টাও, কারণ তুমি শ্রমিক হলেই বিপ্লবী হবে না। তুমি শ্রমিক — কিন্তু তোমার মনের মধ্যে রয়েছে সম্পত্তির প্রতি লোভ, মালিকানার ইচ্ছা, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে চিন্তা। শ্রমিক বলেই তুমি এসব থেকে মুক্ত নও। সর্বহারা বিপ্লবী হতে হলে শ্রমিককেও এই বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, যেকোনও বড় আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত থাকে, তার উন্নত রুচি-সংস্কৃতিগত মানের মধ্যে। মার্কসবাদ এযুগের মহত্তম আদর্শ। একে যারা জীবনে গ্রহণ করবে, তারা দেহে মনে উন্নত সংস্কৃতি সম্পন্ন নতুন মানুষ হবে। এই মানদণ্ডেই এদেশে 'মার্কসবাদী' দলগুলির নেতাদের আচার-আচরণ তাঁকে ধাক্কা দিয়েছিল। জেলে যখন ছিলেন, দেখলেন, মার্কসবাদ নিয়ে যাঁরা ক্লাস নেন, বোঝান ঈশ্বরচিন্তা ভ্রান্ত, তাঁরাই আবার পূজা-অর্চনা করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, এঁদের কাছ থেকে আমি কী মার্কসবাদ শিখব? এঁরা যা বলেন তা বিশ্বাস করেন না, জীবনে প্রয়োগ করেন না। তিনি দেখেছেন, কমিউনিস্ট নেতা বলে যারা পরিচিত, তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের কেরিয়ার গোছাচ্ছেন, বিলেতে পাঠাচ্ছেন, আর অন্যের ছেলেদের বলছেন, বিপ্লবের জন্য সবকিছু ছেড়ে দাও। এ তো ভণ্ডামি, এ তো প্রতারণা, এঁরা কী রাস্তা দেখাবেন? ফলে তিনি বললেন, মার্কসবাদের বইপড়া আর মার্কসবাদকে উপলব্ধি করা — এই দুই-এর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বই পড়ে তুমি পণ্ডিত হতে পার, কিন্তু বিপ্লবী হতে পার না। এম এন রায় সম্পর্কেও একথাই বলেছিলেন। এম এন রায় সে যুগে ভারতবর্ষে শুধু নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কমিউনিস্ট ইনটেলেকচুয়াল বলে খ্যাত, এমনকী লেনিনের সঙ্গে একত্রে সম্মেলন করেছেন, সেই এম এন রায় পরবর্তীকালে কমিউনিস্টবিদ্বেষী হয়ে গেলেন। কিন্তু কেন? কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, এম এন রায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখায় বিচরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পণ্ডিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে আহরিত সত্যকে তিনি মার্কসবাদী দ্বান্দিক বিজ্ঞানের সাহায্যে সংযোজিত করে তা উপলব্ধির ভিত্তিতে জীবনে কী চরিত্র অর্জন করা উচিত, ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে কী অভ্যাস আচরণ করা উচিত — এগুলো বুঝে বিপ্লবের সাথে, শ্রমিকশ্রেণীর সাথে একাত্ম হওয়ার সংগ্রামটা করতে পারেননি।

একমাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষই এদেশের মাটিতে মার্কসবাদকে বিশেষীকৃত করেছেন

সিপিআইয়ের সে যুগের নেতারা সৎ ছিলেন, নিষ্ঠাবান ছিলেন, তাঁদেরও সংগ্রাম ছিল। এজন্য তাঁদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু বলেছিলেন, ওঁরা মার্কসবাদকে পণ্ডিতের মতো করে মুখস্থ করেছেন, জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেননি, জীবনে প্রয়োগ করেননি। কমরেড শিবদাস ঘোষের বিরাট অবদান হচ্ছে, যে মার্কসবাদ আগে এদেশে শুধু আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, পাণ্ডিত্যের চর্চার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, সেই মার্কসবাদকে তিনি ভারতবর্ষের মাটির সাথে যুক্ত করেছেন। ভারতীয় মননে যে সমস্ত বুর্জোয়া চিন্তাভাবনা, সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে, বেদ-বেদান্তের প্রভাব, ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রভাব, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজির চিন্তার প্রভাব রয়েছে — তার থেকে ভারতীয় মননকে মুক্ত করে, চিন্তাকে মুক্ত করে — কেন ভারতবর্ষের শোষণমুক্তির জন্য মার্কসবাদ চাই — যাকে আমরা আমাদের ভাষায় বলি concretisation of Marxism in concrete situation of a country – একটা বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদের জীবন্ত প্রয়োগ বা বিশেষীকরণ — সেই কাজটাই তিনি করেছেন ভারতবর্ষের মাটিতে এবং এই পথে মার্কসবাদকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছেন, যে কাজটা লেনিন করেছেন রাশিয়ার ক্ষেত্রে, মাও সে-তুং করেছেন চীনের ক্ষেত্রে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, বটানি ইত্যাদি প্রকৃতি জগতের এক একটা বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ গতি বা ল' বা নিয়ম আবিষ্কার করে। ফিজিক্স দিয়ে কেমিস্ট্রির কাজ চলে না, কেমিস্ট্রি দিয়ে ফিজিক্সের কাজ চলে না। কিন্তু গোটা বস্তুজগতের সবকিছু পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, একে অপরের সাথে যুক্ত। একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। তাহলে গোটা বস্তুজগৎকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হলে কোন বিজ্ঞান দরকার? এই জিজ্ঞাসা থেকেই মার্কস বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ আহরিত সত্য ও নিয়মগুলিকে দ্বান্দিক প্রক্রিয়ায় সংযোজিত করে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। যে সাধারণ নিয়মগুলি সকল বিশেষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বস্তুজগতের সকলের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সমগ্র জগতের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সার্বজনীন সত্য। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম, বস্তুর গতির নিয়ম ইত্যাদি কোনওটাই বিজ্ঞানীদের সৃষ্টি নয়, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নিয়মগুলি আবিষ্কারের আগেই ক্রিয়াশীল ছিল। বিজ্ঞান এই নিয়মগুলি আবিষ্কার করে মানুষকে সচেতনভাবে ক্রিয়া করতে সাহায্য করেছে। মার্কসবাদের আবিষ্কৃত সাধারণ নিয়মগুলিও নতুন সৃষ্টি নয়। এই নিয়মগুলি অনুযায়ীই বিশ্বপ্রকৃতি চলছে, এই নিয়মেই সমাজ চলছে, সবকিছু চলছে। এই নিয়মগুলিকে মার্কস আবিষ্কার করেছেন, সৃষ্টি করেননি। ফলে মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক দর্শন। প্রকৃতিজগতের সবকিছু যেমন পরিবর্তনশীল, সমাজেও সবকিছু পরিবর্তনশীল। প্রকৃতিজগতে যেমন কোনওকিছু চিরস্থায়ী নেই, গতিশীলতা ও নিয়মের মধ্যে বস্তুর অবস্থান, সমাজেরও গতিশীলতা ও নিয়মের মধ্যেই অবস্থান। আদিম সমাজ, দাসপ্রথা, রাজতন্ত্র পুঁজিবাদ ধাপে ধাপে যে এক একটা সমাজ এল — এগুলি কি আকস্মিক ঘটনা? বিধির খেয়াল? এর কি কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক নেই? মার্কসবাদ দেখিয়েছে, এইগুলিও নিয়ম অনুযায়ীই পরপর এসেছে। কী সেই নিয়ম তা মার্কস আবিষ্কার করেছেন। সেই নিয়মেই পুঁজিবাদের পর সমাজতন্ত্র আসবে, এটাও তিনি দেখিয়েছেন। আবার দেখিয়েছেন, এরপরও সাম্যবাদ, তারও পর পর আরও উন্নত থেকে উন্নততর সমাজ আসতেই থাকবে। এটাই ইতিহাসের নিয়ম।

বুর্জোয়ারা কৃষিতে, শিল্পে, যন্ত্র-অস্ত্র নির্মাণে, যানবাহনে, চিকিৎসাক্ষেত্রে, যেকোনও কনস্ট্রাকশনে, জল-স্থল-ভূগর্ভ-সৌরজগৎ অভিযানে সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান ব্যবহার করছে, বিজ্ঞানের নিয়মকে অনুসরণ করছে। কিন্তু তাদের প্রবল আপত্তি আদর্শ-নৈতিকতার প্রশ্নে, সামাজিক সমস্যার প্রশ্নে, ইতিহাসের প্রশ্নে, সত্যানুসন্ধানের প্রশ্নে বিজ্ঞানের প্রয়োগে। কারণ, তাহলে ওদের বিপদ। তাহলে, সত্য শাশ্বত থাকে না, পুঁজিবাদ, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি চিরস্থায়ী থাকে না। অদৃষ্টের দোহাই থাকে না। তারা বিদেশ থেকে বিজ্ঞান নিতে পারে, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি নিতে পারে, জাতীয়তাবাদ-মানবতাবাদ নিতে পারে, কিন্তু মার্কসবাদ নেওয়া চলবে না। কারণ, তাহলে ওদের বিপদ। অথচ গান্ধীজি নিজেই বলেছেন তাঁর তিনজন শিক্ষকের মধ্যে দুইজনই অর্থাৎ রাস্কিন ও টলস্টয় বিদেশি। বস্তুত গান্ধীবাদে টলস্টয়ের প্রভাবই বেশি।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের পরিকল্পিত আক্রমণ

মনে রাখবেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এদেশের কোটি কোটি শ্রমিক কৃষক গরিব মানুষের মুক্তির প্রয়োজনে। যেসব পার্টি এ দেশে মার্কসবাদের নামে ছিল, তার কোনওটাই কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠতে পারল না। কারণ মার্কসবাদকে তারা জীবন্ত দর্শন হিসাবে গ্রহণ করেনি, জীবনে প্রয়োগ করেনি। তাই মার্কসবাদী সর্বহারা পার্টির গঠনপদ্ধতি কী হবে, ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানবতাবাদী মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা সর্বহারা মূল্যবোধ কাকে বলে, যথার্থ কমিউনিস্ট চরিত্র কী হবে, তা এরা নির্ধারণ করতে পারেনি। কোনও ক্ষেত্রেই তারা মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি। সেইজন্য সিপিআই-এর ইতিহাস আগাগোড়া ভুলের ইতিহাস।

সেই সিপিআই ভেঙে যারা বিপ্লবের কথা বলে সিপিএম নামে আলাদা দল করেছিল, আজ আপনারা তাদের চেহারা দেখতে পাচ্ছেন। এ রাজ্যে ৩০ বছর ধরে সরকারে থেকে তারা মার্কসবাদকে কলঙ্কিত করেছে, এই রাজ্যের সংগ্রামী বামপন্থী ঐতিহ্যকে ধ্বংস করেছে। ভারতের ও বিদেশের বুর্জোয়ারাও জানে, সিপিএম মার্কসবাদী নয়, এরা লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙের সাম্যবাদী আদর্শ অনুসরণ করে না। এরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দলগুলোর মতো ভণ্ড কমিউনিস্ট, যারা মুখে মার্কসবাদ সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ে কাজে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করে। অথচ দেখুন, যে বুর্জোয়ারা সিপিএমকে সরকারে রেখে কৃষক উচ্ছেদ করাচ্ছে, গণআন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন দমন করাচ্ছে, সেই বুর্জোয়ারাই আবার

আটের পাতায় দেখুন

পুঁজিবাদী সমাজ আজ মুক্তিযন্ত্রণায় কাঁপছে

৫ই আগস্ট আসামের সভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

৫ই আগস্ট এস ইউ সি আই আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গৌহাটির লক্ষ্মীরামপুর বড়ুয়া সদনে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের আসাম রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড ভূপেন্দ্রনাথ কাকতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় মুখ্য বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই সারা ভারতবর্ষে এই দিনটি পালিত হচ্ছে। ভারতের মাটিতে একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে এস ইউ সি আই-কে গড়ে তুলতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ যে চিন্তাধারার জন্ম দেন, দেশে এক শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সেই অমূল্য চিন্তার চর্চা ও তার উপলব্ধিকে আরও উন্নত করা এবং সেই পথে শোষিত মানুষের মুক্তিসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই এই দিবসের উদ্‌যাপন। এই দিনটিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে আমাদের সংগ্রামের কর্মসূচি নির্ধারণের চেষ্টা করি।

ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণের কঠিন সংগ্রামের পথে দেশের শোষিত মানুষের মুক্তির মূর্ত প্রতীকরূপে কমরেড শিবদাস ঘোষের অভ্যুদয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনের শুরু একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে। স্কুল পর্যায়ের ছাত্রজীবনেই তিনি সেদিন বঙ্গদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বিপ্লবী ধারা চলছিল তার সাথে যুক্ত হন। এই আন্দোলনের গতিপথেই অন্য কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁরও এই উপলব্ধি গড়ে ওঠে যে, শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত হলেই দেশের ৯০ শতাংশ জনসাধারণের জীবনে মুক্তি আসবে না। সেই সময় মহান লেনিনের নেতৃত্বে সংগঠিত ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে যে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় তার আহ্বানে সারা বিশ্বের শোষিত মানুষের মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার হয়। সেই আহ্বানের পথ ধরেই ভারতের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সেই ধরনের একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জন্ম লাভ করে এবং কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলে সেই স্বপ্ন পূরণের চেষ্টায় তাঁরা ব্রতী হন। কমরেড শিবদাস ঘোষের মধ্যেও সেই আকাঙ্ক্ষা জন্ম লাভ করেছিল। ইতিহাস দেখাল যে, কমরেড ঘোষের সেই আকাঙ্ক্ষাই দেশের মাটিতে বিপ্লবের সঠিক রাজনৈতিক লাইন প্রতিষ্ঠা করেছে।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে আসা দেশের পরিবর্তনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান, ৫০ বছর ধরে চলা আসমুদ্রহিমাচল স্বাধীনতা সংগ্রামের ফল আত্মসাৎ করে ভারতের জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী ব্রিটিশের সাথে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে কংগ্রেসকে সামনে রেখে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে এবং দেশে প্রতিষ্ঠা করে একটা শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। অপূরিত থেকে যায় সর্বপ্রকার শোষণ থেকে জনসাধারণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে গণমুক্তি সম্পন্ন করতে হলে নতুন করে ক্ষমতাসীন জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং সেজন্য তারা যে রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে ব্যবহার করে, তাকে বিপ্লবের আঘাতে নির্মূল করতে হবে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তনের মারফত এই কাজ কখনও হতে পারে না।

এই বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন সঠিক বিপ্লবী দল। মহান লেনিনের শিক্ষাকে তুলে ধরে কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের দেখান, সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ব্যতিরেকে সঠিক বিপ্লবী দল গঠন সম্ভব নয় এবং সঠিক বিপ্লবী দল ব্যতিরেকে বিপ্লব সম্ভব নয়। বিগত শতকের বিশের দশকে আমাদের দেশে গঠিত হওয়া সিপিআই এবং পরবর্তী সময়ে সিপিএম, সিপিআইএমএল ইত্যাদি নামে বহুধা বিভক্ত দলটি কেন সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি, তার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমরেড ঘোষ যে শিক্ষাসমূহ তুলে ধরেন, তার কিছু কিছু উল্লেখ করে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, নবজাগরণের যুগে গড়ে ওঠা মানবতাবাদী আদর্শ তার প্রয়োজন পূরণের পথে আজ নিঃশেষ হয়েছে, আজ প্রয়োজন সাম্যবাদী আদর্শের — যে সাম্যবাদী আদর্শকে মার্কস বলেছেন, 'ব্যক্তিসম্পত্তিবোধমুক্ত মানবতাবাদ'। কমরেড ঘোষ দেখালেন, এই সাম্যবাদী আদর্শের ভিত্তিতে জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে ব্যক্তিসম্পত্তি ও ব্যক্তিসম্পত্তিবোধ থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামে জয়ী হয়ে একদল যুবক যদি এগিয়ে না আসে তাহলে প্রকৃত বিপ্লবী দল, প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। অথচ আমাদের দেশে সিপিআই গড়ে তুলতে আসা ব্যক্তিরা এই ব্যক্তিসম্পত্তিবোধ থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামের দিকটির প্রতি কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে সম্মেলন মারফত কমিটি গঠন করে তাকে কমিউনিস্ট পার্টি বলে ঘোষণা করে দিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল হিসাবে গড়ে উঠতে পারল না। মার্কসবাদী শিক্ষা অনুসারে যেকোনও দলই কোনও না কোনও শ্রেণীর দল। কমরেড ঘোষ আমাদের দেখালেন, এ দলটি একটি পেটিবুর্জোয়া দল হিসাবে গড়ে উঠেছে। পেটিবুর্জোয়া দল শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিপরীতে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে আপস করার চেষ্টা করে বিপ্লবের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কমরেড ঘোষ দেখালেন, এই দলটি ভারতে এখনও সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন চলছে বলে দেশে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শোষণকে আড়াল করার জন্য ধূর্ততার সঙ্গে চেষ্টা চালাচ্ছে। পুঁজিপতিশ্রেণী ক্ষমতায় আসেনি বলে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে তারা দেশের শাসক-শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা করে দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণের সর্বনাশ ঘটাচ্ছে।

কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

এই পথেই সিপিআই, সিপিআই(এম) আজ কার্যত বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দলের মতো কাজ করছে। এদের এই চরিত্র আজ অনেকেই ধরতে পারছেন। কিন্তু সেই ১৯৪৮ সালে যখন বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের আনুকূল্যে গঠিত এই দলটি কিছু কিছু গণআন্দোলন পরিচালনা করেছে, কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর অনন্যসাধারণ মার্কসবাদী বিচারধারা প্রয়োগ করে তখনই এই সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সিপিআই-সিপিএমের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, আজ দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মানুষ শুধু আত্মহত্যা করছে তাই নয়, যাদের আমরা বেঁচে আছে বলে দেখছি, তারাও প্রকৃত অর্থে বেঁচে নেই। আজ ভাই ভাইকে মারছে, মা সন্তানকে মারছে, সন্তান মাকে মারছে, এক জনগোষ্ঠীর লোক অন্য জনগোষ্ঠীর লোককে মারছে। একদিকে দেশের ১০ শতাংশ লোক সকল আরাম আয়েস নিয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করছে, আর অন্যদিকে বাকি ৯০ শতাংশ মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে আত্মঘাতী হচ্ছে, এই তো ৬০ বছরের স্বাধীন ভারতবর্ষের চিত্র! এই অবস্থায় সিপিআই-সিপিএম মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করছে, পুঁজিবাদের বিকল্প নেই। মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার এর থেকে বড় নজির আর কী থাকতে পারে!

এই শ্বাসরোধকারী অবস্থার অবসানের জন্য প্রয়োজন হল, জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধানের দাবিতে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা।

বিপ্লবের অপরিহার্যতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, সোসাইটি ইজ প্রেগন্যান্ট উইথ রেভোলিউশান, কমিউনিস্ট পার্টি হল ধাত্রী। কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কমরেড ঘোষের শিক্ষাকে তুলে ধরে তিনি বলেন যে, কমিউনিস্ট চরিত্রের মান স্থির হয়ে থাকে না। প্রতিনিয়ত তাকে উন্নত করে যেতে হয়। এই প্রক্রিয়া স্তিমিত হলেই দলের মৃত্যু অনিবার্য।

বিপ্লবী দল গঠন ও বিপ্লব সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব সংগ্রামের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, বিপ্লবের জন্য প্রথমে নিজেকে বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তুলতে পারতে হবে। এ প্রসঙ্গে মার্কসের শিক্ষার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্বকে পরিবর্তন করতে হলে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রথমে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র আজ কী? পরমাণু চুক্তির প্রেক্ষাপটে সংসদে অনুষ্ঠিত আস্থা ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যেভাবে গরু-ছাগলের মতো বিক্রি হল, এরপরও গণতন্ত্রের আর কিছু অবশিষ্ট আছে বলে কি আশা করা যায়? সব পুঁজির গোলাম হয়ে গেছে। ৬০ বছরের স্বাধীনতার পরিণতি কী? টাকার জন্য বাবা নিজে যুবতী মেয়েকে ট্রাক ড্রাইভারের হাতে সঁপে দিচ্ছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না— এই তো! কোথায় এর থেকে পরিত্রাণের পথ, কোথায় উচ্চস্তরের নৈতিকতা?

আসামের ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, অভাব, শোষণ-নির্যাতন, মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, দুর্নীতি-ভ্রষ্টাচার থেকে শুরু করে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের নীতির সমস্ত অভিশাপই আসামের জনজীবনে আজ প্রকট। এর বিরুদ্ধে কোনও ধরনের আন্দোলন দূরে থাক; উচ্চবাচ্যও নেই। এখানে একটাই কথা — 'বাংলাদেশি'। খবরের কাগজে প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একই কথা — 'বাংলাদেশি'। কেন? জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে, এককে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে জনসাধারণের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নেওয়ার এর থেকে বড় ষড়যন্ত্র আর নেই। বাংলাদেশি বিতাড়নের প্রশ্নে আপত্তি কারোর নেই। তবু প্রশ্নটা বারবার আসছে কেন? বিষয়টা অন্য জায়গায়। এখানে চলছে বাংলাভাষী মুসলমানদের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার আরএসএস-বিজেপির জঘন্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। একে পরাস্ত করবে কারা? বুর্জোয়াশ্রেণীর কেনা গোলাম বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য বন্ধু মুলায়ম সিংহকে নিয়োজিত করে নির্বাচনের মুখে কংগ্রেসবিরোধী ভোট পাওয়ার জন্য সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের নাটক করে যারা সেই সিপিএম, সিপিআই? কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, আসামের জনসাধারণকে অজ্ঞতার নাগপাশে বেঁধে রাখার চক্রান্ত করছে পুঁজিবাদ। আসামে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে প্রকৃত কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা না হলে আসামের জনসাধারণকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করা যাবে না। আসামের জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার পথেই এই কাজ করা সম্ভব হবে। শোষিত মানুষের শোষণমুক্তির বিপ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখে জনজীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র প্রাদেশিকতাকে প্রতিহত করার সংগ্রামে সৈনিক হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার সঙ্কল্প নেওয়ার আহ্বান তিনি জানান দলের কর্মী-সমর্থক-জনসাধারণের প্রতি।

রিজওয়ানের খুনিদের শাস্তি দিতে হবে

একের পাতার পর

আইনের বিচার, ন্যায়ের বিচার নয়। বহু ক্ষেত্রে দোষীরা শাস্তি পায় না, অথচ আইনের কূট প্যাঁচে নির্দোষদের ফাঁসিয়ে দিয়ে শাস্তি ভোগ করানো হয়। গোটা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিই আজ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। বিচারব্যবস্থা তারই অন্যতম অঙ্গ। এই সমাজে প্রায় সর্বদাই ধনীরা টাকার লোভ দেখিয়ে, প্রশাসনকে কিনে বিচারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে এটা ঠিক, আবার গণআন্দোলন থেকে উদ্ভূত ন্যায়বিচারের দাবি যদি যথেষ্ট জোরালো হয় তবে তাকে উপেক্ষা করাও বিচারব্যবস্থার পক্ষে সহজ হয় না।

সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে দীর্ণ ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ, ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে রিজওয়ান-প্রিয়ঙ্কার পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ের ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নজির হিসাবেই দেখেছেন। তাঁদের বিবাহিত জীবনের উপর পুলিশের থাবা পড়তে দেখে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়েছেন; চিন্তাশীল মানুষেরা রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ন্যূনতম অবশেষকেও কবরে পাঠাতে দেখে আতঙ্কিত হয়েছেন। এস ইউ সি আই শুরু থেকেই এই আন্দোলনের পক্ষে জনগণকে সংগঠিত করার কাজে নেমেছে। ১০ অক্টোবর রিজওয়ানের বাড়ির সামনে বিশাল জনসভায় দলের বক্তব্য তুলে ধরেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। দলের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনের সমর্থনে পুস্তিকা প্রকাশ করে হাজার হাজার কপি জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়। স্কুলে কলেজে ছাত্রছাত্রীরা মোমবাতি জ্বেলে নীরবে ধিক্কার জানান, স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। গোটা রাজ্যের জনমানসে রিজওয়ানের প্রতি সমবেদনা ও অপরাধীদের প্রতি ঘৃণার প্রবাহ বয়ে যায়। রিজওয়ানের হত্যাকারীদের শাস্তির ন্যায়সঙ্গত দাবিতে গড়ে ওঠা রাজ্যব্যাপী গণআন্দোলন এবং রিজওয়ান-প্রিয়ঙ্কার বিবাহিত জীবন, যা ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিলাসী জীবনের হাতছানি উপেক্ষা করে গড়ে উঠেছিল, তাকে এভাবে ধ্বংস করার বিরুদ্ধে জনগণের শুভবুদ্ধি ও সৎ আবেগের উত্তাল জোয়ার আদালতকেও আইনি নিরপেক্ষতা রক্ষার কাজে সাহায্য করেছে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের সত্য উদ্‌ঘাটন ও দোষীদের শাস্তি এখনও বাকি; তাই আত্মসন্তুষ্টি নয়, ন্যায়বিচার আদায় না হওয়া পর্যন্ত জনচেতনাকে জাগ্রত রাখা ও গণআন্দোলন জারি রাখাই এখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আন্দোলনকে সফল লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে গণকমিটি গঠনের ডাক

কাটোয়া

একের পাতার পর

শহরকে বেছে নিয়েছেন। ফলে কাটোয়া শহর সমেত কাটোয়া মহকুমার এক বিস্তীর্ণ এলাকা ব্যবসায়িক দিক থেকেও বিপন্ন হবে।

এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গে নগরায়ন ও শিল্পায়নের জন্য প্রতিবছর ৫০ হাজার একর কৃষিজমি কমে যাচ্ছে। এছাড়া নদী ভাঙনে হাজার হাজার একর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। গত ৫ বছরে প্রায় আড়াই লক্ষ একর কৃষিজমি ভূমিসংস্কার দপ্তর নগরায়ন ও শিল্পায়নের জন্য দখল নিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রান্তিক চাষির জমি। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্যশস্য উৎপাদনের হারের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ায় খাদ্য সুরক্ষার প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরি হিসাবে দেখা দিয়েছে। রাজ্যে খাদ্যশস্যের ভারসাম্য রক্ষা করে প্রধানত দক্ষিণবঙ্গ। অথচ যে হারে রাজ্য সরকার কৃষিজমি অধিগ্রহণ করছে তাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিপর্যয়ের মুখে পড়তে বাধ্য। উল্লেখ্য, গত বছর ৭ জুলাই কৃষিমন্ত্রী নরেন দে বিধানসভায় বলেছেন, ২০০৫-০৬ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি ছিল ১০ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন। এই অবস্থায় কৃষিজমি ধ্বংস করার পরিণাম ভয়াবহ।

এলাকার কাছে কয়লা ও জলের যোগান নেই

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাঁচামাল হচ্ছে মূলত কয়লা ও জল। এই দুটির যোগানের উৎস বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিকটবর্তী হওয়া জরুরি। কারণ, কয়লা পরিবহন ও জল সরবরাহের খরচ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথমত, কাটোয়ার নিকটবর্তী কোথাও কয়লার কোনও উৎস নেই। ঝাড়খণ্ডের দাসাগোড়িয়া কোলিয়ারি থেকে কাটোয়া পর্যন্ত কয়লা নিয়ে আসতে পরিবহন খরচ বেড়ে যাবে। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় বারবার বাড়লে প্রতি বছর বিদ্যুতের দামও বাড়বে। বর্তমানে ফারাক্কাতে গঙ্গার উপর ব্যারেজ নির্মাণের ফলে এবং বাংলাদেশের সাথে জলবণ্টন চুক্তির ফলে গঙ্গানদীতে জলের প্রবাহ কমে যাচ্ছে। সাগরদীঘিতে নতুন যে কারখানা হচ্ছে তার জলের উৎস এই গঙ্গা এবং কাটোয়ার প্রস্তাবিত কারখানার জলের উৎসও এই গঙ্গা। ইতিমধ্যে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জলের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। রূপনারায়ণ নদীর জল কমে যাওয়ার ফলে ৩২ কিমি দূরে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে আসার জন্য নূতন জলের লাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। ফলে, ভবিষ্যতে গঙ্গাগর্ভে জলের প্রবাহ আরও কমবে এবং সেটা হলে উক্ত কারখানাগুলোর অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আনুমানিক স্থায়িত্ব ৩০-৪০ বছর। এই ৪০ বছর ধরে যে পরিমাণ ছাই তৈরি হবে, তাকে জমিয়ে রাখার জন্য প্রায় চার হাজার একর জমির প্রয়োজন হবে। বেআইনি কয়লা তোলার ফলে আমাদের রাজ্যে আসানসোল শিল্পাঞ্চল সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় মাটির নীচ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। ফাঁকা জায়গায় প্রয়োজনীয় বালি ভরাটের কাজ হচ্ছে না। ফলে এলাকায় ধস নামছে। আগামী দিনে গোটা শিল্পাঞ্চলের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। যদি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই দিয়ে এই ভরাট করার কাজ হত তাহলে ছাই জমা রাখার জন্য বিশাল পরিমাণ জমির প্রয়োজন হত না। আশপাশ অঞ্চল পরিবেশ দূষণ থেকেও বাঁচত। ফলে, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কাটোয়ার পরিবর্তে কোলিয়ারি সংলগ্ন এলাকায় স্থাপন করাটা সমস্ত দিক থেকে সুবিধাজনক।

সিপিএমের মিথ্যাচার

এখন বিদ্যুৎ পরিবহন ন্যাশনাল গ্রিড-এর আওতায়। অর্থাৎ ভারতবর্ষের যে কোনও প্রান্ত থেকে বিদ্যুৎ যে কোনও প্রান্তে নিয়ে আসা কোনও সমস্যাই নয়। তাছাড়া বিদ্যুৎ কোনও আঞ্চলিক বাজারের পণ্যও নয়। ফলে অন্যত্র তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে কাটোয়ার অগ্রগতি হবে না এ কথা সত্য নয়।

তাছাড়া বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড ৪০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে প্রথম পর্যায়ের ১২০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন কারখানার কাজ শেষ করবে ২০১১ সালের মধ্যে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ১২০০ মেগাওয়াট সম্পন্ন ইউনিটের কাজ শুরু হবে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে। এই ঘোষণা গত ১ আগস্ট লিমিটেডের পক্ষ থেকে নতুন করে করা হয়। প্রথম পর্যায়ে আনুমানিক ৬০০ জন স্থায়ী কর্মী এবং নির্মাণকালে প্রায় ১০০০ জন অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ হবে, যাঁরা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেই কাজ হারাবেন। আজকের যুগের উন্নত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ কারখানা চলবে। ফলে যে ৬০০ জন কর্মী স্থায়ীভাবে কাজ পাবেন, তাদেরও বেশির ভাগই বিভিন্ন ধরনের ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, বিএসসি এবং আইটিআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী হবেন, যা কিনা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মারফৎ সারা রাজ্য থেকে নেওয়া হবে। এর সঙ্গে জমিহারাদের চাকরি দেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে, স্থানীয়ভাবে প্রতি ঘরের এক জনকে কাজ দেওয়া হবে— সিপিএমের এই প্রচার মিথ্যা ও ধাপ্পা।

বর্তমান বিপিডিসিএল-এর পুরানো প্রকল্পগুলি হল সাঁওতালডি, বক্রেশ্বর, কোলাঘাট এবং ব্যান্ডেল। নতুনভাবে সাগরদিঘীতে শুরু হয়েছে ৩০০ মেগাওয়াটের দুটি ইউনিটের কাজ। সাঁওতালডিতে ২টি নতুন ২৫০ মেগাওয়াট ইউনিট, বক্রেশ্বরে দুটি ৩০০ মেগাওয়াট ইউনিট স্থাপনের কাজ চলছে। যদি আরও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজন হয় তাহলে উক্ত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় মেগাওয়াটের একাধিক ইউনিট খোলা যেতে পারে। এছাড়া মুলাজোড় ও গৌরীপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ আছে। ওখানে আবাসন শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা হচ্ছে। ওখানে পরিকাঠামো থাকার সুবাদে নতুন ইউনিট খোলা যেতে পারে।

চাষের জমিতে যুগ যুগ ধরে চাষ করা যায়। কিন্তু এইসব চাষযোগ্য জমিতে বিদ্যুৎ কারখানা হলে আগামী ৩০-৪০ বছর পর যখন কারখানা আপন নিয়মে বন্ধ হয়ে যাবে তখন ওখানে আর ওখানে নতুন করে চাষ করা যাবে না। চিরকালের জন্য এই বিস্তীর্ণ এলাকা পতিত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

কৃষক ও খেতমজুরদের লাগাতার সংগ্রাম

২০০৫ সালে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি বের হওয়ার পর থেকেই জীবন ও জীবিকার স্বার্থে স্থানীয় কৃষক ও খেতমজুররা এক সপ্তাহের মধ্যেই ১০ আগস্ট 'কৃষিজমি, কৃষক ও খেতমজুর বাঁচাও কমিটি' গড়ে তোলে। কমিটির উদ্যোগে ১৫ সেপ্টেম্বর প্রায় ৩ হাজার কৃষক ও খেতমজুর মিছিল করে কাটোয়ায় মহকুমাশাসককে ডেপুটেশন দেয়। তারপর ২০০৭ সালের ২৮ জানুয়ারি কাটোয়া রবীন্দ্রভবনে 'সারা বাংলা কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটি' এবং 'কৃষিজমি, কৃষক ও ক্ষেতমজুর বাঁচাও কমিটি'র যৌথ আহ্বানে পরিবেশবিদ চির দত্ত ও রাজ্য কৃষক নেতা খোদাবক্সের উপস্থিতিতে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে কাটোয়া শহরের বুদ্ধিজীবীরা এবং উপস্থিত সকলেই অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। রাজ্য সরকার কৃষক ও খেতমজুরদের দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে জমি জরিপ ও পরিদর্শনের চেষ্টা করলে পুনরায় ঐ বছর ৯ অক্টোবর কমিটির পক্ষ থেকে এসডিও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ঐ বছরই ১০ ডিসেম্বর ও ২০০৮ সালের ২ জানুয়ারি কাটোয়া মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়। কিন্তু সেই বৈঠকে এস ইউ সি আই-কে যেমন আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, তেমনি জমিরক্ষার সংগ্রামরত 'কৃষিজমি, কৃষক ও খেতমজুর বাঁচাও কমিটি'কেও ডাকা হয়নি। এস ইউ সি আইয়ের পক্ষ থেকে সরকারের এহেন আচরণের প্রতিবাদে এসডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া ও বিক্ষোভ জানানো হয়। এর প্রতিলিপি জেলাশাসক দপ্তরেও পাঠানো হয়। কৃষক ও খেতমজুর বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকেও এর প্রতিবাদে ডিএম-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রপতি থেকে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে স্মারকপত্র পেশ করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেস এই সর্বদলীয় বৈঠক বয়কট করে। ২০০৭ সালে শ্রীখণ্ডে সরকারের পক্ষ থেকে গোপনে সিপিএমের সহায়তায় জনশুনানি হয়। এই সংবাদ দ্রুত জানাজানি হলে কমিটির পক্ষ থেকে নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে অগণতান্ত্রিক জনশুনানি বন্ধ করার দাবি জানাতে থাকে। আবার ১৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীখণ্ডে এস ইউ সি আই এবং কৃষক ও খেতমজুরদের কমিটিকে বাদ দিয়ে স্থানীয়ভাবে সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে, পঞ্চায়েত প্রধান, প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পঞ্চায়েত মাধ্যমে কিছু চাষিদের নিয়ে এক জনশুনানি হয়। এই শুনানিতে উপস্থিত রাজনৈতিক দলগুলি জমি দেওয়ার পক্ষে মত দেয়। স্থানীয় বিধায়ক ও কংগ্রেসের নেতা রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীও উপযুক্ত প্যাকেজের বিনিময়ে জমি নিলে তাঁর পক্ষ থেকে কোনও বিরোধিতা থাকবে না বলে জানিয়ে দেন। কিন্তু উপস্থিত চাষিরা কোনও কিছুর বিনিময়ে জমি দেবেন না বলে মত প্রকাশ করলে জনশুনানি ভেস্তে যায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সিপিএমের হার্মাদবাহিনী নিরীহ কৃষকদের উপর চড়াও হয়ে মারধর করে। কয়েকজন কৃষক আহত হন, তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। এর বিরুদ্ধে পুনরায় কমিটির পক্ষ থেকে সিপিএমের হার্মাদদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও শাস্তিদানের দাবিতে এসডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

গত ২৭ মে প্রশাসন কাটোয়া ১নং ব্লকের শ্রীখণ্ড ও দেবকুণ্ডু মৌজার ৩৫০ একর জমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করে। তার বিরুদ্ধে ৪০৩ জন চাষি জেলাসদরে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতায় কৃষকদের পক্ষ থেকে গত ১৬ জুলাই কোশিগ্রামে জনশুনানির আয়োজন করা হয়। এই জনশুনানির বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মেধা পাটকর, সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় মলয় সেনগুপ্ত প্রমুখ। এই শুনানিতে আমন্ত্রিত ছিলেন এস ইউ সি আই, সিপিআই(এম-এল) এবং এপিডিআর-এর নেতৃবৃন্দ। এস ইউ সি আইয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, এলাকার কৃষক ও খেতমজুররা সরকারের কাছে অনেক যুক্তিগ্রাহ্য আবেদন-নিবেদন করেছেন। এর পরেও যদি সরকার এই বহুফসলি জমিতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত বদল না করে তাহলে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ধাঁচে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এরপর সরকারের পক্ষ থেকে গত ৩০ জুলাই, ১ আগস্ট ও ৪ আগস্ট — তিন দিনের জনশুনানিতে কৃষকদের ডাকার সিদ্ধান্ত হয়। প্রথম দু'দিনে সমস্ত চাষিরাই জমি না দেওয়ার কথা জানালে তৃতীয় দিনের জনশুনানি হঠাৎই স্থগিত হয়ে যায়। বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা প্রশাসন ও পিডিসিএল-এর পক্ষ থেকে বলা হয় চাষিরা যদি জমি দিতে না চান, তাহলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কাটোয়ার পরিবর্তে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে স্থানান্তরিত করা হবে।

কিন্তু কৃষিজমি, কৃষক ও খেতমজুর বাঁচাও কমিটির অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস ভাবাদর্শের সাথে যুক্ত থাকার ফলে কংগ্রেস রাজনীতির আপসমুখীনতার প্রভাব এবং কংগ্রেসের নেতা ও বিধায়কের নিরুৎসাহ দানের ফলে চাষিদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আন্দোলন প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করতে ব্যর্থ হয়। কংগ্রেস নেতৃত্ব জমি রক্ষার আন্দোলনের সামনের সারিতে থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমকে পরাস্ত করে প্রস্তাবিত এলাকার সমস্ত পঞ্চায়েত দখল করে। হাজার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও যখন আন্দোলন জয়ের পথে, তখন সিপিএম নেতৃত্ব কংগ্রেসের সাথে বোঝাপড়া করে ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে জমি অধিগ্রহণের হীন কৌশল অবলম্বন করেছে।

কাটোয়া অঞ্চলের মানুষদের দীর্ঘ ৩০ বছরের দাবি কাটোয়া-বর্ধমান ন্যারোগেজ রেলপথকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা। ৩০ জুন,২০০৭ রেলমন্ত্রী এই প্রকল্পের উদ্বোধনও করেন। অথচ, সিপিএম প্রচার করছে, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্যই রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সহযোগিতায় ব্রডগেজ করছে; যদি অধিগ্রহণবিরোধী আন্দোলনের চাপে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র না হয় তাহলে ব্রড গেজের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। জনগণকে ব্ল্যাকমেল করার সিপিএমের এই ঘৃণ্য অপকৌশলের বিরুদ্ধে যখন সমস্ত মানুষ সোচ্চার হতে শুরু করেছে, ঠিক তখন হঠাৎই সিপিএম কংগ্রেসকে আহ্বান জানিয়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে সফল করতে ব্রডগেজের দাবিকে সামনে এনে মাঠে নামতে শুরু করেছে।

এলাকায় এলাকায় গণকমিটি গঠনের ডাক

এস ইউ সি আই প্রথম থেকেই বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দলগুলো সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক থেকে এলাকার সমস্ত কৃষক ও খেতমজুরদের সংগঠিত করে কৃষিজমি, কৃষক ও খেতমজুর বাঁচাও কমিটিকে সহযোগিতা করে আসছে। বহু গ্রামে গণকমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করে কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কমিটির নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা এবং এলাকায় এস ইউ সি আইয়ের প্রয়োজনীয় শক্তি না থাকার ফলে আন্দোলনকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আগামী দিনে এই আন্দোলনকে সফল লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে আন্দোলনের যথার্থ শক্তি হিসাবে গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায়, ছাত্র-যুবক, মা-বোন-কৃষক-খেতমজুরদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও গণকমিটি গঠন করতে এবং আন্দোলনের একমাত্র হাতিয়ার কৃষিজমি, কৃষক ও খেতমজুর বাঁচাও কমিটির নেতৃত্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এস ইউ সি আইয়ের পক্ষ থেকে দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

লালগোলায় ছাত্র আন্দোলনের জয়

লালগোলা ব্লকের রহমতুল্লা হাই মাদ্রাসা সহ বিভিন্ন স্কুল থেকে পাশ করা প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তির দাবিতে ডিএসও-র উদ্যোগে 'লালগোলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি' গঠন করে। কমিটির নেতৃত্বে ২৭ জুন বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি এম এন অ্যাকাডেমিতে আসন বাড়ানোর দাবি জানায়। এই আন্দোলনকে ভাঙতে এস এফ আই সমস্ত রকম অপচেষ্টা চালায়। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ৯ জুলাই ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। আন্দোলনের চাপে এম এন অ্যাকাডেমিতে আসন বাড়ানো হয় এবং ভর্তি হতে না পারা ছাত্রদের এম এন অ্যাকাডেমি সহ নিকটস্থ হাইস্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা ও রহমতুল্লা হাই মাদ্রাসাকে অবিলম্বে উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন লালগোলার বিডিও।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ

পাঁচের পাতার পর

সিপিএম-এর সমস্ত অপকর্মকে দেখিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রচার করাচ্ছে যে, এগুলোই কমিউনিস্টরা করে, এই সিপিএম নেতাদের মতোই ছিলেন লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সেতুঙ। এ একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ।

এজন্যই রাজ্যের জনগণের মধ্যে সিপিএম-এর প্রতি বিরোধিতার সাথে রয়েছে মার্কসবাদ ও বামপন্থার প্রতি বিরোধিতার সুর, যেটা বিপজ্জনক। এহলে জনগণ যেমন শোষণ-অত্যাচার থেকে মুক্তির রাস্তা পাবে না, পাশাপাশি জনগণের সিপিএমবিরোধী এই ক্ষোভের সুযোগ নেবে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি। ফলে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের আদর্শ, সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের আদর্শকে সকলরকম বুর্জোয়া আক্রমণ থেকে রক্ষা করা আমাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য এবং সেই লড়াই আমরা করে যাচ্ছি। এজন্য মার্কসবাদ কাকে বলে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কাকে বলে, সংগ্রামী বামপন্থা কাকে বলে, কেন বিপ্লব ছাড়া মুক্তি নেই — এই বিশ্লেষণ ব্যাপক জনগণের মধ্যে আমাদের নিয়ে যেতে হবে, এটাই আজকের দিনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকলে কী হত

যাঁরা আজ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা করছেন, তাঁদের কাছে প্রশ্ন করুন — সোভিয়েত ইউনিয়ন কি কোনও দিন কোনও যুদ্ধ বাধিয়েছিল? প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং আজও মধ্যপ্রাচ্য সহ সর্বত্র যে যুদ্ধ চলছে, কারা তার জন্য দায়ী? দায়ী সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে উপনিবেশ বানিয়েছিল কারা? সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ। যার বিরুদ্ধেই লড়াই করেছে সমাজতন্ত্র। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র শান্তির অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে কাজ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকলে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন কি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত? জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন কি শক্তি পেত? কেন হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষ বসু বলেছিলেন, আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা সোভিয়েত ইউনিয়ন? যারা পুঁজিবাদের পক্ষে, তাঁরা বলুন — পুঁজিবাদ কী দিয়েছে মানুষকে? শোষণ-লুণ্ঠন-নির্যাতন-বেকারি-নারীর অবমাননা-পর্নোগ্রাফি-পঙ্কিল সংস্কৃতি আর বারবার যুদ্ধ। এই তো পুঁজিবাদের অবদান!

প্রশ্ন উঠতেই পারে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটল কেন? প্রথমত, মার্কস থেকে মাও সে-তুং, কেউই বলেননি, সমাজতন্ত্র একবার কায়েম হলে তার পতনের কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং উল্টোটাই বলেছেন। বলেছেন, পুঁজিবাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর সমাজতন্ত্রে ক্ষমতাচ্যুত পুঁজিপতিশ্রেণীর আক্রমণক্ষমতা আরও বহু গুণ বেড়ে যায়। এই পর্যায়ে পার্টি ও রাষ্ট্র সঠিকভাবে সংগ্রাম চালাতে না পারলে আবার পুঁজিবাদ ফিরে আসে। এই আশঙ্কা থেকেই এ বিষয়ে স্ট্যালিন জীবনের শেষ দিকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। মাও সে-তুং মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু এঁরা কেউই শেষ করে যেতে পারেননি। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, সমাজতন্ত্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটালেও চিন্তা ও সংস্কৃতির জগতে ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তিসম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা বহুদিন থেকে যায়। ফলে এর বিরুদ্ধে দীর্ঘ তীব্র লড়াই চালাতে হয়। প্রধানত এই ক্ষেত্রে ঠিকমতো লড়াই করতে না পারার জন্যই সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয় ঘটল। এর থেকে শিক্ষা নিয়েই আগামী দিনে দেশে দেশে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠবে।

আজকের নৈতিক সঙ্কটের কারণও পুঁজিবাদ

আজ পুঁজিবাদ তার চরম প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই ব্যাপক সংকট এনেছে তা নয়, চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদ, ব্যক্তির আত্মসর্বস্বতা এনেছে। সামাজিক জীবনে, ব্যক্তিজীবনে কোথাও কোনও নৈতিকতা কাজ করছে না। মায়া-মমতা-কর্তব্য-দায়িত্ববোধ-মাতৃত্ব-পিতৃত্ব সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দাম্পত্য জীবনেও সুখশান্তি নেই। সমাজ সম্পর্কে উন্নাসিক হয়ে যাচ্ছেন। আদর্শ-নীতির ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছেন। এই সঙ্কটের কারণ কী? কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, যে ধর্মীয় মূল্যবোধ এক সময় সমাজজীবনে কাজ করেছিল, কালের গতিপথে আজ তা নিঃশেষিত। বুর্জোয়া মানবতাবাদী, জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিও আজ কাজ করছে না, সর্বহারা নৈতিকতাও বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। পাশাপাশি শাসকশ্রেণী ও শাসকদলগুলি নিজেদের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য নোংরা সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহ দিচ্ছে। ফলে জাতির মূল্যবোধের ক্ষেত্রে গভীর শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। আর মূল্যবোধ ও নৈতিকতাহীন মানুষ আর মানুষ থাকে না। বুর্জোয়া বাজার অর্থনীতিতে শুধু উৎপাদিত সম্পদই নয়, মানুষ এবং মানুষের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা সব কিছুই আজ বাজারের পণ্য। চূড়ান্ত ভোগবাদ সবকিছুকে গ্রাস করছে। যা দেখে সৎ মানুষেরা আতঙ্কিত। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতি মূল্যবোধের সংকটের অবসানের জন্যও চাই পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব। আমরা যে গুরুত্ব দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, গণআন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, তার আশু লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন দাবি আদায়, জনগণকে নানা আক্রমণ থেকে যতটা সম্ভব রক্ষা করা, আর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীকে, শোষিত জনগণকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে, উন্নত নৈতিক বলে বলীয়ান করে ধাপে ধাপে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করা। কমরেড শিবদাস ঘোষ মহান লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী একথাও বলেছেন, কেন্দ্রে ও রাজ্যে যে দল যে ঝান্ডা নিয়েই পুঁজিবাদের স্বার্থে কাজ করুক, তাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর জনগণকে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে যে যে দলকে যতটা এবং যতক্ষণ পাওয়া যায়, তাদের সাথেও যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে আন্দোলনের স্বার্থেই ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যের নীতি বজায় রেখে।

আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে আমরা যে গণকমিটি গঠনের কথা বলছি, সেই চিন্তাও আমরা পেয়েছি কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছ থেকে। তিনি বারবার বলেছেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেও সঠিক পথে ও লক্ষ্যে চালনা করতে হলে, নিচুস্তর থেকে জনগণের সংগঠিত শক্তি গড়ে তুলতে হবে। গণকমিটি হবে তারই মাধ্যম। জনগণকে উদ্দেশ্য করে তিনি বারবার বলেছেন, কোনও নেতা, কোনও দলকে অন্ধের মতো মানবেন না; আন্দোলনে যুক্ত সকল দলের বক্তব্য শুনবেন ও বিচার করবেন — কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল। সকল দলের বক্তব্য জানার পর জনগণই গণকমিটিতে বসে কর্মসূচি নির্ধারণ করবেন, রূপায়ণও তাঁরাই করবেন। এই পথেই একদিন গণকমিটিগুলির মধ্য দিয়ে এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তির বিকল্প জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া সম্ভব, যেটি না ঘটলে বিপ্লব হবে না, সমাজপরিবর্তন ঘটবে না।

কমরেড শিবদাস ঘোষ শুরু করেছিলেন মুষ্টিমেয় চার পাঁচজন সাথী নিয়ে, সহায়সম্বলহীনভাবে। অর্থের শক্তিতে নয়, প্রচারের শক্তিতে নয়, লোকসংখ্যার শক্তিতে নয়, মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা এবং জ্ঞান ও সত্যের শক্তির ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের অভ্যুত্থান। আজ ভারতবর্ষের দিকে দিকে হাজার হাজার ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষক তাঁর চিন্তাধারাকে জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে শোষিত মানুষের আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলছে। বিদেশেও কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে নতুন করে বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করার পথ ও প্রেরণা খুঁজে পাচ্ছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, আমার অস্তিত্ব, আমার বেঁচে থাকা বিপ্লবেরই জন্য। আজ মহান নেতার স্মরণদিবসে, আসুন আমরা শপথ নিই, শোষণমুক্তির বিপ্লবী লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা দেহে-মনে কমরেড শিবদাস ঘোষের যোগ্য ছাত্র হওয়ার সংগ্রামে সর্বস্ব দিয়ে আত্মনিয়োগ করব।

সি আই এ-র হীন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন —কেন্দ্রীয় কমিটি

১৯৬৫ সালে তদানীন্তন সমাজতান্ত্রিক চীনের অভ্যন্তরে গোয়েন্দাকর্ম চালাতে একটি পরমাণুশক্তিচালিত তেজস্ক্রিয় আড়িপাতা যন্ত্র হিমালয়ের শিখরে স্থাপন করার জন্য রবার্ট স্কলার নামে পেশায় চিকিৎসক, অপেশাদার এক পর্বতারোহীকে সিআইএ নিয়োগ করেছিল — সম্প্রতি প্রকাশিত এই সংবাদে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৫ আগস্ট এক প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই ঘটনা পুনরায় দেখিয়ে দিল যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই কুখ্যাত গোয়েন্দাবাহিনী, কীভাবে সকল আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে দেশে দেশে দুষ্কর্ম চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দুনিয়াজোড়া এই জঘন্য কাজের নিন্দায় সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জনগণকে তিনি সোচ্চার হওয়ার এবং এই ধরনের ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বাধ্য করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

ফি-বৃদ্ধি প্রত্যাহার ও ভর্তি সমস্যা সমাধানের দাবিতে মুর্শিদাবাদে ছাত্র বিক্ষোভ

মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় সহস্রাধিক ছাত্র আজও উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হতে না পেরে স্কুলের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। এরই পাশাপাশি কলেজে কলেজে ফর্ম নিয়ে ব্যবসা, ভর্তি নিয়ে স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের দলবাজি, শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের নির্দেশে কর্তৃপক্ষের ছাত্রস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত, ছাত্রদের কাছ থেকে শত শত টাকা অনৈতিকভাবে আদায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং জেলার প্রতিটি ব্লকে কমপক্ষে একটি করে গার্লস স্কুল স্থাপনের দাবিতে ৯ জুলাই মুর্শিদাবাদ জেলা ডিএসও ছাত্র বিক্ষোভ ও অবরোধের কর্মসূচি পালন করে। ডিএসও জেলা সভাপতি কমরেড অনুপ সিন্‌হার নেতৃত্বে তিনজনের এক প্রতিনিধিদল ডি আইকে দাবিপত্র দেয়। এরপর মিছিল ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করলে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকরাও এতে অংশগ্রহণ করেন এবং আটকে-পড়া যাত্রীরাও সহমত জানান। অবরোধে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড অভিজিৎ মণ্ডল ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজিত পাত্র। সভাশেষে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করে।

এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের কর্মসূচি

রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৮ আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরব্যাপী তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে এবং দলগতভাবে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ২৪ আগস্ট সিঙ্গুরের মহামিছিল, ক্ষুদ্রব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির প্রবেশের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য দাবিতে ১ সেপ্টেম্বরের মিছিল এবং ২১ সেপ্টেম্বর রিজওয়ানের বাড়ি থেকে যে মিছিল বের হচ্ছে তাতে এস ইউ সি আই সামিল হবে।

সিঙ্গুরে জমি দিতে অনিচ্ছুক চাষিদের জমি ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধা আছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, জোর করে অন্যের জমি দখল করে নিয়ে তারপর ফেরত দেওয়ার সময় 'সাংবিধানিক বাধা আছে' বলা বাজে অজুহাত মাত্র।

২০ আগস্ট ঃ সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের অন্যতম আহ্বায়ক এস ইউ সি আইয়ের শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি। এ রাজ্যে সরকারের বিরুদ্ধে সিটু আন্দোলনে রাজি না হওয়ায় এখানে এ আই ইউ টি ইউ সি আলাদাভাবে ধর্মঘট আহ্বান করেছে।

৩১ আগস্ট ঃ ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন এবং ১৯৯০ সালের বাসভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে শহীদ কমরেড মাধাই হালদার স্মরণে জেলায় জেলায় সমাবেশ এবং কলকাতায় রানি রাসমণি রোডে কমরেড মাধাই হালদার শহীদবেদির সামনে সভা।

৯ সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি ও যৌনশিক্ষা চালুর প্রতিবাদে কলকাতায় ছাত্রদের মিছিল ও সমাবেশ।

১০ সেপ্টেম্বর ঃ সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির আহ্বানে শ্রমমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন ও সমাবেশ।

১১ সেপ্টেম্বর ঃ অ্যাবেকার আহ্বানে বিদ্যুৎমন্ত্রীর দপ্তরে বিক্ষোভ।

১২ সেপ্টেম্বর ঃ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি সহ জনগণের জ্বলন্ত দাবিগুলি নিয়ে জেলায় জেলায় জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ ; তার আগে ব্লকস্তরে পর্যায়ক্রমে অবস্থান।

১৭ সেপ্টেম্বর ঃ শরৎচন্দ্রের ১৩৩তম জন্মদিবস পালন।

২৪ সেপ্টেম্বর ঃ প্রীতিলতার ৭৬তম শহীদ দিবস পালন।

২৫ সেপ্টেম্বর ঃ অ্যাবেকার আহ্বানে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের দপ্তরে বিক্ষোভ।

২৬ সেপ্টেম্বর ঃ বিদ্যাসাগরের ১৮৯তম জন্মদিবস পালন।

সবশেষে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের অনুরোধে তাদের কর্মসূচিগুলিতে আমরা সামিল হচ্ছি। আমাদের কর্মসূচিগুলিতেও সামিল হওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে আহ্বান জানিয়েছি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in